উপন্যাস

সমুদ্রতীরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com

সূচিপত্র

১-৪. আকাশের আলো 2
৫-৮. চন্দ্রা আমার সঙ্গে 20
৯-১৩. সারা দিন বর্ষার পর 42

১-৪. আকাশের আলো

জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে মনে হল, এখন আর ঘরে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। বিকেল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশের আলো মিলিয়ে যায়নি।

আজ সারা দুপুর বইয়ের পাতায় ডুবে ছিলাম। এক-এক দিন পড়াশোনায় খুব মনে বসে যায়, এক-এক দিন কিছুটা অস্থির ভাব থাকে। আজ খুব বেশি হাওয়া ছিল না, গরমও ছিল না। বই পড়তে পড়তে আজ একবারও খেয়াল হয়নি যে কাছেই একটা সমুদ্র আছে।

বেরুবার আগে জানলা দুটো মনে করে বন্ধ করে দিতে হয়, নইলে হাওয়ায় সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। টেবিলের ওপর গোটা চারেক কলা পড়ে আছে, খোসার ওপর কালচে কালচে ছোপ পড়েছে। এগুলো ফেলে দেওয়াই ভাল। আমি কলা তেমন একটা ভালবাসি না, তবু কিনেছিলাম অসম্ভব সস্তা বলে। ছ'খানা মর্তমান কলার দাম মাত্র এক টাকা।

কলাগুলো হাতে নিয়ে বেরুতে গিয়ে আমি একটু হাসলাম। মানুষ একা একা নিজের কাছেও মিথ্যে বলে! শুধু সস্তা বলেই কি আধ ডজন কলা কিনেছিলাম? না, তা ঠিক নয়।

কিশোর কলা বিক্রেতাটি এসে বসেছিল বিচের ওপর। সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজকেও ছাড়িয়ে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করছিল, কেলা, কেলা, কেলা! আস্তে আস্তে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল তাকে কেন্দ্র করে। আমি তখনও যাইনি, বসেছিলাম তটরেখার একেবারে ধার ঘেঁষে। চমৎকার রোদ-ঝকঝকে সকাল। খুব জোর হাওয়া তখন। এ-রকম প্রবল হাওয়ায় মেয়েরা শাড়ি সামলাতে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে, দেখতে বেশ লাগে।

সেই মেয়েটি, তার নাম চন্দ্রা, সে-ও দাঁড়িয়েছিল কলাওয়ালার সামনে। তার সবুজ রঙের শাড়ির আঁচলটা উড়ছিল পত পত করে। সকালবেলার পক্ষে বড় বেশি উজ্জ্বল রঙ তার শাড়ির। তবে ওরা ওই রকমই বেশি রঙচঙে, ঝলমলে পোশাক পরে, সকালবেলাতেও প্রসাধন না করে বাইরে বেরোয় না।

চন্দ্রা এক হাতে ধরেছিল উড়ন্ত আঁচল, অন্য হাতে এক থোকা কলা। থোকা কথাটা বোধহয় ঠিক হল না, ফুলের থোকা হয়, কলার কি হয়? সবুজ শাড়ি পরা চন্দ্রার হাতে সেই নিখুঁত হলুদ রঙের কলাগুলো ফুলের মতোই দেখাচ্ছিল। রঙের সেই সমন্বয় আমার পছন্দ হল। সেই দৃশ্যটার কাছাকাছি যাওয়ার জন্যই আমার কলা কেনার কথা মনে হয়েছিল। আমি চন্দ্রার একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

চন্দ্রার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

বাইরে এসে কলাগুলো ফেলতে গিয়েও মনে হল, এখনও ঠিক পচেনি, শুধু শুধু নষ্ট না করে খেয়ে নিলেও তো হয়। একটা খোসা ছাড়িয়ে খানিকটা মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম থুঃ থুঃ করে। পচে যায়নি বটে কিন্তু বেশি মজে গেছে, তলতলে ভাব, এই স্বাদটা আমার ঘোরতর অপছন্দ। নাঃ, খাওয়া যাবেনা।

অনেক সময় কাছাকাছি ভিখিরিরা ঘুর ঘুর করে। তাদের কারুকে দিয়ে দেওয়া যেত। এখন কেউ নেই।

চন্দ্রাকে আমি বলেছিলাম, আমার জন্য কয়েকটা বেছে দাও তো।

চন্দ্রা নিজের হাতে এই কলাগুলো তুলে দিয়েছিল। আমি তার হাতের আঙুল ও স্বর্ণাভ মুখখানা দেখছিলাম।

তিন দিনেই কলাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বালির ওপর। তারপর আবার এগিয়ে গিয়ে সেগুলো তুলে একটুখানি ডান দিকে যেতে হল। সেদিন ঠিক এই জায়গায় বসেছিল কলাওয়ালাটি। বালির ওপর কারুর পায়ের ছাপ থাকে না, কিন্তু চন্দ্রা কোথায় দাঁড়িয়েছিল, তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেখানেই ফিরিয়ে দিলাম কলাগুলো।

.

০২.

সমুদ্রে সূর্যাস্ত আমার দেখতে ভাল লাগে না। বড় বেশি জমকালো। ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। বরং সূর্য ডুবে যাবার পর যে কিছুক্ষণ মধুর-বিষণ্ণ আলো, তখনকার আকাশের দিকে চোখ চলে যায়। এই আলোটা গায়ে মাখলেও বেশ আরাম বোধ হয়।

এরপর অন্ধকার হয়ে গেলে ঢেউয়ের ফণাগুলো জ্বলবে। গোপালপুরে আমি যতবার এসেছি, রাত্তিরের দিকে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলতে দেখেছি। মাইকেলের সেই লাইনটা মনে পড়ে যায়, কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ...। মাইকেলের আসল লাইনটা ছিল সমুদ্রের প্রতি বিদ্রুপের, এখানে সেটা প্রশস্তি হয়ে যায়।

চটি খুলে রেখে আমি জলে পা দিলাম। ঢেউ এসে পায়ের ওপর ঝাপটা মারে, আবার সরে যায়। এই সময় নিজেকে বেশ রাজা রাজা মনে হয়। এত বড় সমুদ্র, সে আমার পায়ে এসে লুটোচ্ছে। আমার পাদবন্দনা করে যাচ্ছে।

একজন ভদ্রলোক এই অসময়ে জাঙিয়া পরে স্নানে নামছেন। আমার পাশ দিয়ে খানিকটা জলের মধ্যে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু শুনলেন?

আমি দু'দিকে ঘাড় নাড়লাম।

এখন আর এখানে দাঁড়াবার কোনও মানে হয় না। এক জন মাঝবয়সি পুরুষের স্নানের দৃশ্য কে দেখতে চায়?

সাদা ফেনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম ডান দিকে। কিছু কিছু মানুষজন বসে আছে বালির ওপর। অনেকেরই মুখ চেনা। আকাশ শুষে নিচ্ছে শেষ আলো, মুখগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

হঠাৎ খেয়াল হল, আমি পাম বিচ হোটেলের দিকে যাচ্ছি কেন? উলটো দিকে জেলেদের বস্তির দিকে গেলে ভাল হত। কিন্তু এদিকে চলে এসেছি অনেকটা।

পাজামার ওপর পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, টাকা-পয়সার খামটা রয়েছে। আমার মানি ব্যাগ বা যাকে পার্স বলে, তা ব্যবহার করার অভ্যেস আজও হল না। পাম বিচ হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া যেতে পারে, ওরা চিকেন প্যাটিসও খুব ভাল বানায়। কিন্তু ওখানে গেলে সিনেমার লোকজনদের সঙ্গে দেখা হবেই, তাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে।

কিংবা তাদের সঙ্গে গল্প করার লোভেই কি আমি এ-দিকে চলে এসেছি? কৌতূহল আমাকে টেনে এনেছে?

আমি গোপালপুর পৌঁছবার পর দিন তিনেক জায়গাটা বেশ নিরিবিলি ছিল। এখানে কোনও তীর্থস্থান নেই, কখনও খুব বেশি ভিড় হয় না, সেটাই গোপালপুরের বৈশিষ্ট্য।

এখানে এসে আমি কখনও হোটেলে উঠি না। অনেক কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়। খুব ছেলেবেলায় যখন প্রথমবার আসি, তখন প্রচুর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দেখেছি। আমার শৈশবের চোখে তারা ছিল সাহেব-মেম। বুড়োবুড়ি অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা এখানে বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবন কাটাত, একখানা দু'খানা ঘর ভাড়া দিত। এখন তারা আর নেই।

অনেক বাড়ির ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। দেয়াল ভাঙা, জানালা-দরজা নেই। কোস্ট লাইন খানিকটা এগিয়ে এসেছে, জোয়ারের সময় প্রথম সারির অনেক বাড়িতে ছলাত ছলাত করে ঢেউ ধাক্কা মারে।

আমি একটা পুরো বাড়িই ভাড়া নিয়েছি, কারণ একা থাকাই আমার উদ্দেশ্য। যখন ইচ্ছে হবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলব না, কোনও মানুষের মুখও দেখব না। রান্নাবান্নারও ঝামেলা রাখিনি। বেশ কাছেই একটা গেস্ট হাউস রয়েছে। গোটা ছয়েক পরিবার থাকার মতো, সেখানে বললেই চা থেকে সব কিছু পাঠিয়ে দেয়। একটি তেলেঙ্গি স্ত্রীলোক দু'বার আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে, খাবার জল তুলে দিয়ে যায়। তার স্বামীই বাড়িটির কেয়ারটেকার। স্বামীটি মাছ ধরার নৌকো নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের অনেকখানি গভীরে।

তিন দিন পর সিনেমার বিরাট দলটি এসে উঠল পাম বিচ হোটেলে। তাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, হোটেলটাও বেশ দূরে, তবু বেশ বিরক্ত বোধ করেছিলাম আমি। তারা যে খুব একটা হই-হট্টগোল করে, তা-ও না। কিন্তু এই ছিমছাম নিরিবিলি জায়গায় এক সঙ্গে অনেক লোক এসে পড়েছে, যখন তখন গাড়ি হাঁকিয়ে তারা ঘোরাঘুরি করছে। এটাই যেন অসহ্য বোধ হয়।

সিনেমার শুটিঙের মতো বিরক্তিকর জিনিস আমি কখনও দেখতে যাই না। মনে আছে, একবার থাকতে গিয়েছিলাম চিল্কার এক গেস্ট হাউসে। খুবই সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু হঠাৎ পরদিন সেখানে শুরু হল একটা তামিল ফিলমের শুটিং। একটা গান বাজানো হচ্ছে, যুবতীটি বার বার নাচতে শুরু করছে, আর পরিচালক হেঁকে উঠছে, কাট, কাট! একই গান, একই নাচ, শুরু হচ্ছে আর থামছে, এই রকম চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই দিনই বিকেলে আমি পালিয়েছিলাম চিল্কা থেকে।

এখানেও এক দিন শুটিং হচ্ছিল আমার বাড়ির খুব কাছেই। আমার দেখতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এরা অবশ্য মাইকে গান-টান কিছু বাজাচ্ছে না, জলের ধারে প্রেমালাপের দৃশ্য, তারপর স্নান। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমি একবার শুটিং পার্টিটা দেখেই জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আর কিছুতেই লেখাপড়ায় মন বসেনা। জানলা বন্ধ, তবু যেন আমি দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা, লোকজন, নায়ক-নায়িকা। সে এক মহা জ্বালা।

পরদিন আমি দুপুরে স্নান করতে নেমেছি, তখনই আবার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হল সিনেমার দলবল।

সে-দিন আবার জলের মধ্যে মারামারির দৃশ্য। ওরা অন্য লোকজনদের সরিয়ে দিচ্ছে। আমি বেশ রেগে গিয়ে রোঁয়া ফোলাচ্ছি। আমাকে একবার সরে যেতে বলুক না, দেখিয়ে দেব মজা। আমি স্নান করতে এসেছি, আমার যখন ইচ্ছে উঠব। এই সমুদ্রটা সিনেমার লোকদের বাবার সম্পত্তি নয়। ওরা ফাঁকা জায়গায় যাক না!

কিন্তু ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে গেল।

সাদা টুপি পরা এক জন লোক আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আরে, সুনীলবাবুনা? কবে এসেছেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে রাগের বদলে আমাকে পেয়ে বসল একরাশ লজ্জা। এখন মেয়েদের সামনে দিয়ে আমাকে খালি গায়ে উঠতে হবে।

.

০৩.

পাম বিচ হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাব কি না এখনও মনস্থির করতে পারছি না। এক-একসময় মানুষের সংসর্গের জন্য মন আনচান করে, তবু মানুষের কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে করে না। মুখটা ফেরাতেই চমকে উঠলাম। শুধু চমক নয়, বুকটা ধক করে উঠল। ঠিক ভয়ের অনুভূতি।

একটা ডিঙি নৌকোর গলুইয়ের কাছে বসে আছে একটি মেয়ে। কালো রঙের শাড়ি পরা। কিংবা শাড়ির রঙ গাঢ় নীলও হতে পারে। মুখটা জলের দিকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথমে মনে হয়েছিল চন্দ্রা, এবং সেই জন্যই ভয় পেয়েছিলাম। অথবা চন্দ্রা হতেই পারে না। চন্দ্রা যদি ফিরে আসে কোনওক্রমে, তাহলে কি আমি ভয় পাব?

অবিকল চন্দ্রার মতো ভঙ্গিমায় এখানে এখন কে বসে থাকতে পারে? এই দৃশ্যটার মধ্যে বেশ অস্বাভাবিকতা আছে। প্রায় অলৌকিকের কাছাকাছি। এই সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তবু বুক তো কেঁপে উঠল একবার।

আমি এতখানি রাস্তা হেঁটে আসছি, নৌকোগুলোতে আগেই দেখেছি, কেউ ছিল না। মেয়েটি হঠাৎ কী করে এল? ঠিক আছে, ধরা যাক, ওর নীল রঙের শাড়ি অন্ধকারে মিশে

গেছে বলে ওকে আমি আগে দেখতে পাইনি। তাহলেও সন্ধের পর কোনও মেয়ে তো এখানে এমন ভাবে একা বসে থাকে না। স্থানীয় মেয়ে নয়, কোনও জেলের বউ নয়, মেয়েটির দু'হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই একটা শহুরে ছাপ আছে।

তীব্র কৌতূহল আমাকে টেনে রেখেছে, জায়গাটা ছেড়ে নড়তে পারছি না। হাওয়া বাঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

নৌকোগুলোর তলায় জলের ছলাত ছলাত শব্দ হচ্ছে, জল বাড়ছে। শুরু হয়েছে জোয়ার। যে নৌকোগুলি অর্ধেক বালির ওপর ওঠানো থাকে, জোয়ারের সময় সেগুলোই অনেকখানি জলের মধ্যে চলে যায়। মেয়েটি কি তা জানে না?

তিন দিন আগে সন্ধের সময় চন্দ্রাও এ-রকমভাবে বসে ছিল একটা নৌকোয়।

কাছাকাছি আর কোনও মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, একটি মেয়েকে দেখে আমি থমকে গিয়ে সিগারেট টানছি, এটা বেশ বিসদৃশ ব্যাপার।

তবু আমার মনে হল মেয়েটিকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে এগুতেই মেয়েটি নেমে পড়ল নৌকো থেকে। আমার উপস্থিতি সে টের পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না, একবারও তাকাল না পেছন ফিরে, সোজা হাঁটতে লাগল জলের ধার ঘেঁষে।

এরপর আর মেয়েটিকে অনুসরণ করা যায় না। তবু আমি তাকিয়ে রইলাম সেই অপস্রিয়মাণ নারীর দিকে। মেঘলা আকাশ, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবু আকাশের কিছুটা নিজস্ব আলো আছে। এক সময় মেয়েটি কি জলে নামতে শুরু করল না। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল? স্পষ্ট মনে হল, মেয়েটি সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে, হাঁটু জল ছাড়িয়ে বুকজলে, তারপর ডুব দিল, আর উঠল না।

আমি সে-দিকে ছুটে যাবার জন্য উদ্যত হয়েও থেমে গেলাম। এ-সব কী ছেলেমানুষি করছি আমি একটা মেয়ে সত্যি সত্যি জলের মধ্যে নেমে মিলিয়ে যেতে পারে? জলকন্যা? ভূত? যতই অবিশ্বাস করি, তবু ভেতরে ভেতরে কিছু সংস্কার রয়েই গেছে। ও-সব কিছু না! ও-দিকটায় খানিকটা কুয়াশা জমেছে। মেয়েটি কুয়াশার আড়ালে চলে গেল। তাছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

নিজের এ-রকম দুর্বলতায় নিজের ওপর চটে গেলাম খুব। এই অবস্থায় আর কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়া যায় না। অন্যদের কাছেও আমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতে পারে।

.

০৪.

রবীন ঘোষ যে একজন পুলিশ অফিসার, সে-কথা তিনি আমার কাছে একবারও গোপন করেননি। যদিও অন্য আর কেউই বোধহয় তা জানে না। ভদ্রলোক এখানে সপরিবারে ছুটি কাটাতে এসেছে। ওর স্ত্রীর কিছু একটা অসুখ আছে। যদিও ওঁর স্ত্রী প্রতিমা বেশ বিদূষী ও পরিচ্ছন্ন চেহারার মহিলা, কথাবার্তায় কোনও আড়ষ্টতা নেই, অসুস্থ বলেও বোঝা যায় না। ওঁদের সঙ্গে দশ বছরের মেয়েও এসেছে, বড় ছেলে হস্টেলে থাকে।

রবীন ঘোষ ইংরিজি সাহিত্যের খুব ভক্ত। দুর্গাপুরে কোনও একটি সভায় উনি আমাকে দেখেছিলেন, সামান্য পরিচয়ও হয়েছিল, আমার অবশ্য সে-কথা একেবারেই মনে নেই। আমি পুরুষদেব মুখ মনে রাখতে পারি না। এখানে ওঁরা উঠেছেন পাশের গেস্ট হাউসে, এক দিন নিজে থেকেই আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে।

প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে আপনি কিছু লিখতে এসেছেন বুঝি? নতুন উপন্যাস?

আমি উত্তর না দিয়ে হেসেছিলাম। লোককে বোঝানো শক্ত। লেখার জন্য আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় না। নির্জনতাও খুঁজতে হয় না। নিজের বাড়িতে কিংবা অফিসে নানান গোলমাল, হইচই, লোকজনের আসা-যাওয়া, দরজার বেল, টেলিফোনের যখন তখন ঝঙ্কার, স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি, বাজার করা, নাটকের রিহার্সাল দেওয়া, এর মধ্যেও দিব্যি লেখা এগিয়ে চলে। কিন্তু কখনও কখনও আমার না-লেখা নিজস্ব সময় দরকার। লেখার থেকে পুরোপুরি ছুটি নেবার জন্যই নির্জনতা খুঁজি। যখন এই রকম বাইরে চলে আসি একা, সঙ্গে কাগজ কলমও রাখি না। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি এক জন লেখক বটে, কিন্তু আমার কোনও কলম নেই।

গেস্ট হাউসে আমার খাবারের কথা বলতে গেলে রবীন ঘোষ আমাকে ধরে ফেললেন।

উনি অবশ্যই একেবারেই জোর করেন না, কথা বলেন খুব মৃদু গলায়। বললেন, আসুন, ওপরে গিয়ে একটু বসা যাক। পরে এক সময় খেয়ে নিলেই হবে।

গেস্ট হাউসটি দো-তলা। রবীনবাবুরা একটা সুন্দর সুইট পেয়েছেন। শোবার ঘরের সংলগ্ন একটা বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানে বসলে সমুদ্রের সম্পূর্ণ বিস্তার দেখা যায়।

প্রতিমা আগে থেকেই সেখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গুন গুন করে গান গাইছিলেন।

এ-সব ক্ষেত্রে ভদ্রতা করে বলতে হয়, থামলেন কেন? আপনার তো বেশ ভাল গলা। গানটা করুন।

প্রতিমা তবু গান থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, কিছু কিছু গান থাকে একলা গাইবার। ও আপনাকে নিশ্চয়ই গল্প করার জন্য টেনে এনেছে, বউয়ের গান শোনাবার জন্য নয়।

আমি আর জোর করলাম লা। সত্যিই তো কিছু কিছু গান মানুষ শুধু নিজেকে শোনাবার জন্যই গায়।

রবীনবাবু আমাকে ডেকে আনায় খুশিই হয়েছি। আমি মানুষের সঙ্গ চাইছিলাম, কিন্তু নিজে থেকে কারুর কাছে যেতে পারি না, এটা আমার স্বভাবদোষ। কেউ ডাকলে মনে হয়, এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

ওঁদের মেয়েটি বসবার ঘরে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করছে।

আমরা বারান্দায় বসার পর প্রতিমা একটা ছোট টেবল এনে রাখলেন, তারপর নিয়ে এলেন গেলাস, জলের জাগ ও হুইস্কির বোতল।

রবীনবাবু বললেন, নিচে ওদের বললে সোডা পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিমা আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, আমার সোডার দরকার নেই।

প্রতিমা তিনটি গেলাসে হুইস্কি ঢাললেন।

আগেই এক দিন লক্ষ্য করেছি যে ওঁকে মদ খাওয়াবার জন্য পিড়াপিড়ি করতে হয় না, উনি নিজেই নিজেরটা নিয়ে নেন। কিন্তু একবারই। মদ্যপান বিষয়ে ওঁর কোনও সংস্কার নেই, অথচ নেশাও করতে চান না।

দূরের অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কারণ তাদের মাথায় দুলছে ফসফরাসের মালা। বেশ দেখায়। এদিকে জাহাজ চলাচল করে কদাচিৎ। এক দিন শুধু একটা আলো ঝলমল জাহাজ দেখা গিয়েছিল এর মধ্যে। রাত্তিববেলা জাহাজ দেখার জন্য আমি ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয়ে থাকি।

রবীনবাবু বললেন, ওরা আজ থেকে আবার শুটিং শুরু করছে, জানেন তো?

কথাটা আমার একটা আঘাতের মতো লাগে। আবার শুটিং শুরু হয়ে গেছে? পরিচালক সন্তোষ মজুমদারের সঙ্গে আমার সকালেই একবার দেখা হয়েছিল, উনি তখন কিছু বলেননি।

রবীনবাবু বললেন, এখন ওরা হোটেলের মধ্যেই কিছু কিছু শট নেবে। পরশু থেকে আবার আউটডোর।

রবীন ঘোষ আর্ট ফিল্মের ভক্ত। পৃথিবীর নানা দেশের ভাল ভাল ফিল্মের খবরাখবর রাখেন। সেই জন্যই শুটিঙের ব্যাপারে ওঁর খুব উৎসাহ। যদিও সন্তোষ মজুমদার যে ফিলমের শুটিঙের জন্য গোপালপুরে এসেছেন, সেটা একটা রদ্দি গল্প। ওঁদের ধারণা, এই সব ছবি কমার্শিয়াল হিট করবে, আবার এইসব ছবিই রিলিজ করার পর দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই উঠে যায়। সন্তোষ মজুমদার আমার একটা গল্প নিয়ে ফিরতে চেয়েছিলেন, প্রথমেই বলেছিলেন, আমি দাদা প্রাইজ-ফ্রাইজ পাওয়ার জন্য কিংবা ফরেনে যাবার জন্য সিনেমা তুলিনা, আমি চাই দর্শকদের খুশি করতে। বেশ কয়েক দিন আমার বাড়িতে যাওয়া-আসা করেছিলেন উনি, আমার কয়েকটি সকালের কাজ নষ্ট করলেন, এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়ালেন এক বাচ্চা প্রোডিউসারকে দিয়ে, তারপর হঠাৎ এক দিন সবাই অদৃশ্য, সে-ফিল্মের মহরতও হল না। সিনেমা জগতে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সন্তোষ মজুমদার মানুষটিকে অবশ্য আমার খারাপ লাগে না, বেশ খোলামেলা, হাসিখুশি ধরনের, নিজের বোকামি কিংবা মূর্খতা চাপা দেবারও কোনও চেষ্টা নেই।

প্রতিমা বললেন, আমরা ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি দলবল নিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু সিনেমা তোলা তো অনেক টাকার ব্যাপার, শুটিং বন্ধ করে দিলে প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে। টাকার হিসেব করলে মানুষের সেন্টিমেন্টের কোনও দাম নেই।

রবীনবাবু বললেন, চন্দ্রার বডি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ অবশ্য ম্যাড্রাস থেকে আরও দু'জন ডুবুরি আনাচ্ছে। তবে এর মধ্যে তিনটে জোয়ার-ভাটা হয়ে গেছে, এরপর বডি রিকভার করার আশা খুব কম।

প্রতিমা ধমক দিয়ে বললেন, অ্যাই। তুমি আবার পুলিশি ভাষায় কথা বলছ? তোমাকে এখানে ডিউটিতে পাঠানো হয়নি। তোমাকে বলেছি না, তুমি ওই নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না। এটা স্বর্গ নয়, তুমিও ঢেঁকি নও।

রবীনবাবু হেসে ফেলে বললেন, ডিউটি না করলেও সাধারণ কৌতূহল থাকবে না। এ-রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল...এই যে সুনীলবাবু, ওঁরও কি কৌতূহল নেই? আচ্ছা সুনীলবাবু আপনি ঠিক করে বলুন তো, আপনার মতে, এটা খুন না আত্মহত্যা?

আমি বললাম, কী জানি, আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।

রবীনবাবু বললেন, তবু মনে মনে একটা কিছু ধারণা তো তৈরি হয়। সেটাই বলুন না। আপনার মতামতের একটা মূল্য আছে।

আমি বললাম, কেন? আমার মতামতের আবার কীসের মূল্য?

রবীনবাবু বললেন, আপনি মানুষের চরিত্র স্টাডি করেন তো। সামারসেট মম তাঁর আত্মজীবনীতে কী লিখেছেন জানেন? লেখক, স্কুল মাস্টার আর ডিটেকটিভ, এদের মধ্যে একটা মিল আছে। এরা মানুষের চরিত্র ভাল বোঝে।

প্রতিমা বললেন, এখানে এক জন মাস্টারও রয়েছে।

রবীনবাবু বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো!

তখনই আমি জানলাম যে প্রতিমা একটি কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি দর্শন পড়ান।

রবীনবাবু বললেন, তাহলে আমরা তিন জনে মিলে এই ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার একটা বিশ্লেষণ করতে পারি। পুলিশ হিসেবে এই তদন্তে আমার কোনও ভূমিকা নেই, কিন্তু এক জন সাধারণ মানুষ হিসেবে কৌতূহল তো থাকবেই। আচ্ছা সুনীলবাবু, আপনিই আগে বলুন, আপনার ইনটুইশন কী বলছে, এটা খুন না আত্মহত্যা?

আমি মাটির দিকে চেয়ে রইলাম। চন্দ্রাকে আমি ভাল করে চিনিই না। গোপালপুর আসবার আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কোনও ফিল্মেও তার অভিনয় দেখিনি। সন্তোষ মজুমদার আমার সঙ্গে চন্দ্রার পরিচয় করিয়ে দিলেন, সে-দিন পাম বিচ হোটেলে ফিল্ম ইউনিটের সঙ্গে আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। চন্দ্রা তখন বসে ছিল আমার ঠিক পাশে। চন্দ্রা এই ফিল্মের নায়িকা নয়, নায়কের ছোট বোন, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নয়, তবে কাহিনির ভিলেন একবার তাকে কিডন্যাপ করবে, তারপর নায়ক এসে বীরত্ব দেখাবে। এই ফিল্মের নায়িকার চেয়ে কিন্তু চন্দ্রা অনেক বেশি রূপসী।

আমার পাশে বসেছিল বলেই চন্দ্রার সঙ্গে আমার ভাব জমে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। সে বই-টই পড়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাশ করেছে। তাছাড়া সে হাসতে জানে, সমস্ত মজার কথায় সে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যাদের রসবোধ আছে, যারা জীবনের উপভোগটাকে বেশি মূল্য দেয়, তারা কি আত্মহত্যা করে? আমি বললাম, চন্দ্রার মতো মেয়ে আত্মহত্যা করবে, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সবেমাত্র তার ফিল্ম কেরিয়ার শুরু হয়েছে, সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

রবীনবাবু বললেন, বয়সটা তো অল্প, এই বয়সের মেয়েরা খুব ইমোশনাল আর ইমপালসিভ হয়, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে ফেলতে চায়। এরমধ্যে আবার ব্যর্থ প্রেমের অ্যাঙ্গেল আছে কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি এখনও।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না না, ব্যর্থ প্রেম-ট্রেম...ফিল্মের মেয়েরা কি সে-সবের কোনও গুরুত্ব দেয়? চন্দ্রার ব্যবহারে আমি সেরকম কোনও ছায়া দেখিনি। নাঃ, আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। চন্দ্রা এমন প্রাণ খুলে হাসে, ঠিক ব্রুড করার টাইপই নয়।

প্রতিমা বললেন, আপনি চন্দ্রা সম্পর্কে পাস্ট টেন্স ব্যবহার করছেন না। আপনি এখন চন্দ্রার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেননি, তাই না?

আমি অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সন্ধেবেলা নৌকোর ওপর বসে থাকা নীল শাড়ি পরা রহস্যময়ীর কথা কিছুতেই এঁদের সামনে বলব না ঠিক করে ফেলেছি।

চন্দ্রার জলে-ডোবা শরীর কেউ এখনও দেখিনি। অমন সুন্দর একটি যৌবনবন্ত শরীর শেষ পর্যন্ত মাছেদের খাদ্য হল?

রবীনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ন্যাটালি উডের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? ন্যাটালি উডের ঘটনাটা জানেন?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই প্রতিমা বললেন, ন্যাটালি আবার কী? মেয়েটির নাম নেটালি উড। ওয়েস্ট সাইড স্টোরির নায়িকা ছিল।

রবীনবাবু ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, আবার তুমি মাস্টারি শুরু করলে? আমিও যেমন এখানে পুলিশ অফিসার নই, তুমিও মাস্টারনি সাজতে পারবে না। বাঙালিরা ন্যাটালিই বলে। উচ্চারণের ব্যাপারে এত খুঁতখুঁতে হবার কী আছে? বিদেশিরা আমাদের নামের উচ্চারণ ভুল করে না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নেটালি উড... সে-ও জলে ডুবে মারা গিয়েছিল না?

এক জন পুলিশ অফিসার হিসেবে রবীনবাবুর চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে জ্ঞান সত্যি বিস্ময়কর। তিনি হলিউডের চিত্রতারকাদের জীবনীর খুঁটিনাটিরও খবর রাখেন।

তিনি বললেন, লস এঞ্জেলস শহরে প্যাসিফিক মহাসাগর জেটি ঘাটে অনেক অল্পবয়সি ছেলে মেয়ে সার্ফিং করে, পালতোলা নৌকোও বাঁধা থাকে, অনেক লোকেরই প্রাইভেট বোট থাকে জানেন নিশ্চয়ই, আপনি তো ও-দেশে গেছেন, তাই না? আমি যাইনি অবশ্য, কিন্তু এত ছবি দেখেছি, তা ন্যাটালি..ওঃ, ন্যাটালি না, নেটালি উড একদিন শুটিঙের রিসেস-এর সময় কাককে কিছুনা জানিয়ে...ওর কী-রকম সুন্দর চেহারা ছিল মনে আছে? কিছুতেই যেন বয়েস বাড়ত না, রবার্ট রেডফোর্ডের সঙ্গে একটা ছবিতে নামল, তখনও ও নায়িকা, কী যেন নাম ছবিটার?

প্রতিমা বললেন, 'দিস প্রপার্টি ইজ কনডেমন্ড', টেনেসি উইলিয়ামের কাহিনি, পরিচালক সিডনি পোলাক।

আমি মুগ্ধভাবে প্রতিমার দিকে তাকালাম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়!

রবীনবাবু বললেন, নেটালি উডের মনে কোনও ক্ষোভ থাকার কথা নয়, রূপ-খ্যাতি-অর্থ সবই আছে, তবু এক দিন শুটিঙের ফাঁকে সে চলে এল সমুদ্রের ধারে, চড়ে বসল একটা নৌকোয়, ভাসতে ভাসতে চলে গেল অনেক দূরে, গভীর সমুদ্রে, আর ফিরে এল না। অ্যাকসিডেন্ট হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রায় সবাই আত্মহত্যা বলেই মেনে নিয়েছে।

প্রতিমা বললেন, নেটালি ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল, সেই সঙ্গে বিয়ার খেত খুব। অনেকের ধারণা, সে নৌকায় মাতাল অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, নৌকোটা বহু দূরে চলে যায়, আর ফিরতে পারেনি।

রবীনবাবু বললেন, চন্দ্রা ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল কি না, সেটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আজকাল ফিল্ম লাইনের অনেকে, শোনা যায় স্মিতা পাতিলও...।

আমি বললাম, না, চন্দ্রার ড্রাগের নেশা ছিল না।

রবীনবাবুঝট করে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আপনি কী করে জানলেন? এখানে আসবার আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলেছিলেন।

আমি বললাম, সেটা ঠিক, তবু ওই যে আপনি বললেন, মানব চরিত্র বোঝার ক্ষমতা? চন্দ্রার সঙ্গে দু'একদিন মিশেই, যে-কোনও মানুষের সঙ্গে খানিকটা মিশেই এ- সব বুঝতে পারি। চন্দ্রার টাইপটা ও-রকম ছিল না।

রবীনবাবু বললেন, উধাও হয়ে যাবার আগের দিন চন্দ্রা আপনার বাড়িতে এসেছিল। একা এসেছিল। আপনার কাছে নিশ্চয়ই সে অনেক কথা বলেছে।

প্রতিমা বললেন, আবার তুমি ওভাবে...ঠিক পুলিশি জেরার মতো কথা বলছ?

রবীনবাবু লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, আই অ্যাম সরি। অভ্যেস সহজে কাটানো যায় না। তাহলে সুনীলবাবু, আপনি বলছেন চন্দ্রা আত্মহত্যা করেনি?

আমি আস্তে আস্তে দু-দিকে মাথা নাড়ালাম। যদিও আত্মহত্যার চেয়ে খুন অনেক বেশি জঘন্য ব্যাপার।

প্রতিমা বললেন, চন্দ্রার অবশ্য ফাসট্রেশানের অনেক কারণ থাকতে পারে।

রবীনবাবু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তা জানলে কী করে? তুমি কি চন্দ্রার সঙ্গে এক দিনও কথা বলেছ?

প্রতিমা বললেন, না, বলিনি। দূর থেকে দেখেছি। তবে পত্র পত্রিকা পড়ে আমি এই সব মেয়ের কেরিয়ার ফলো করি। একটি অল্পবয়সি মেয়ে মেল ডমিনেটেড ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কী করে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে, কীভাবে সেই মেয়েটিকে অন্যরা ব্যবহার করে, সেগুলো নোট করা আমার অভ্যেস। চন্দ্রার দুতিনটে ইন্টারভিউ আমি পড়েছি সস্তা সিনেমার কাগজে। ওর অনেক অভিযোগ। এ পর্যন্ত চন্দ্রা মোট আট-দশটা ফিল্মে অভিনয় করেছে, সবই ছোট ইনসিগনিফিকেন্ট রোল। কেউ এ পর্যন্ত ওকে ভাল সুযোগ দেয়নি।

শিক্ষিত ভাল পরিবারের মেয়ে, ওর নিজস্ব রুচিবোধ ছিল, প্রোডিউসার ডিরেক্টরদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়নি বলেই বোধহয় ও ভাল রোল পায়নি। তাছাড়া বেচারা সত্যজিৎ-মৃণাল-গৌতমের মতো কোনও বড় পরিচালকের নজরেও পড়েনি।

রবীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চন্দ্রার অভিনয় কোন ফিল্মে দেখেছ? দেখোনি নিশ্চয়ই!

প্রতিমা বললেন, না, বাবা রক্ষে করো। এই সব বাংলা ন্যাকা ন্যাকা ছবি আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

রবীনবাবু বললেন, আমিও আগে দেখিনি, তবে এই ছবির শুটিঙে আমি কয়েক জায়গায় উপস্থিত ছিলাম। চন্দ্রা দেখতে যে-রকম ভাল, চেহারায় যত চাকচিক্য, সেই তুলনায় অভিনয় প্রায় কিছুই জানত না, কেমন যেন কাঠপুতুলের মতো। সেই জন্যই পরিচালকরা ওকে ইমপর্টান্ট রোল দিতে চায় না, ওর শরীরটাকেই বেশি করে দেখায়। এই ছবিতে সন্তোষ মজুমদারও তো ওর এক-একটা সিন পাঁচ-ছ'বার করে টেক করতে হত বলে খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন মাঝে মাঝে। শুনেছি উনি চন্দ্রার রোল খানিকটা ছেঁটে আরও ছোট করে দেবেন ভাবছিলেন।

প্রতিমা বললেন, এতে চন্দ্রার মন ভেঙে যেতে তো পারেই।

রবীনবাবু বললেন, ফিল্ম লাইনে এ-রকম স্ট্রাগল করতে হয় অনেককেই। হঠাৎ একটা ব্রেক আসে। এইটুকু ফ্রাসট্রেশানের জন্য কেউ আত্মহত্যা করে না।

ওঁদের মেয়ে টিনা পড়াশুনো শেষ করে উঠে এসে বলল, মা, তোমরা খেতে যাবে না? আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

রবীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার খেতে যাব। তুই নিচে ডাইনিং রুমে গিয়ে অর্ডার দে তো আগে। এই সুনীল আঙ্কেলও আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন।

প্রতিমা বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও!

তারপর তিনি উঠে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আস্তে আস্তে আপন মনে বললেন, যদি আত্মহত্যা করতেই হয় তাহলে নেটালি উডের মতোই। কী সুন্দর, আস্তে আস্তে একটা নৌকোয় ভেসে যাওয়া, দূরে, গভীর সমুদ্রে, চারপাশে আর কেউ নেই, কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, যেন প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া।

৫-৮. চন্দ্রা আমার সঙ্গে

চন্দ্রা আমার সঙ্গে নিজে থেকেই একবার দেখা করতে এসেছিল ঠিকই।

চন্দ্রার ব্যবহারে ফিল্ম অ্যাকট্রেসসুলভ কোনও ভাব ছিল না। যেন এমনিই এক জন উজ্জ্বল তরুণী, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

যে-দিন ঘটনাটা ঘটল, তার আগের দিনই বিকেলের দিকে হঠাৎ চন্দ্রা উপস্থিত হয়েছিল আমার বাড়িতে। সে-দিন প্রায় সারা দিন ধরেই বেলাভূমির এখানে-সেখানে শুটিং চলছিল বলে আমি আর বাইরে বেরুইনি, এমনকী স্নান করতেও যাইনি।

চন্দ্রা এসে বলল, আমি কোনও দিন কোনও লেখকের ঘর দেখিনি, একবার আপনার লেখার টেবিলটা দেখব। আপনি এখন কী লিখছেন?

এই বাড়িখানায় তিনটে ঘর, তার মধ্যে একটা তালা দেওয়া, সেখানে মালিকের জিনিসপত্র আছে। আর দুটি ঘরেই খাট-বিছানা পাতা, অর্থাৎ বেডরুম। একটা বড় ঘেরা বারান্দাই বসার জায়গা। আমি পুরো বাড়িটা ভাড়া নিলেও একখানা মাত্র ঘর ব্যবহার করি। কোনও ঘরেই কোনও লেখার টেবিল নেই।

কিছু লেখা তো দূরের কথা, আমার কাছে যে একটা সাদা পৃষ্ঠাও নেই, তা চন্দ্রা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

খাটে ওপর অনেক বইপত্র ছড়ান। চন্দ্রা বইগুলো তুলে তুলে দেখছিল। আমার একটা বিচিত্র স্বভাব আছে। আমি একটানা একখানা বই পড়ে শেষ করার বদলে, একই সঙ্গে চার-পাঁচখানা বই একটু একটু পড়ি। সব বই-ই সেইভাবে ওলটানো। সেই সব বই দেখে চন্দ্রা প্রথমে ভুরু তুলল, তারপর হাসতে হাসতে বলল, আপনি এইগুলো পড়ছেন?

যদুনাথ সরকারের অ্যানেকডোটস অব আওরঙ্গজেব, বৈষ্ণব পদাবলী, বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, রাজশেখর বসুর মহাভারত, নীরদ সি চৌধুরির দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক, ইনিড স্টার্কির বদলেয়ারের জীবনী এই সব বইয়ের পরস্পরের মধ্যে কোনও মিল নেই। আমিও তো কোনও কাজের জন্য পড়ছিনা, পড়ার জন্যই পড়া, আসবার সময় হাতের কাছে এগুলোই পেয়েছি। কেউ দেখে ফেললে লজ্জা লাগে।

বিকেলের পর চন্দ্রার আর শুটিং নেই, তাই সে চলে এসেছিল, বেশ হাসিখুশির মুডে ছিল, কোনও রকম ফ্রাসট্রেশানের চিহ্নই আমার চোখে পড়েনি।

চন্দ্রা আমার কাছে কোনও গোপন কথা কিংবা তার জীবনী শোনাতেও আসেনি, কোনও ফিল্মের প্রসঙ্গই তোলেনি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কীভাবে কাড়াকাড়ি করে বই পড়ত সেই গল্প শোনাচ্ছিল।

চন্দ্রা আমার বাড়িতে একা এসেছিল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ একা থাকেনি। মিনিট পনেরো পরেই ওদের ফিল্ম ইউনিটের আর দুটি ছেলে-মেয়ে চন্দ্রাকে খুঁজতে চলে এল। ওরা সেই রাতেই একবার বেরহামপুরে কী সব কেনাকাটা করতে যাবে। পল্লব আর সুনেত্রা ওরা স্বামী-স্ত্রী। পল্লব অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান আর সুনেত্রা আছে প্রোডাকশানে, কনটিনিউটি নোট করাই তার প্রধান কাজ।

পল্লব আর সুনেত্রা আমার সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না, এরা প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাকে।

এই পল্লবই পরের সন্ধেবেলা চন্দ্রাকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখে।

সমুদ্রের ধারে একটা ডিঙি নৌকোয় একা বসেছিল চন্দ্রা। আকাশে তখন ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না, চন্দ্রার পা দুটো ঝোলানো ছিল জলের মধ্যে। পল্লব তাকে জিজ্ঞেস কবেছিল, এই তুই এখানে বসে আছিস যে?

চন্দ্রা বলেছিল, এমনিই।

পল্লবের হাতে তখন একটা মদের বোতল, পাম বিচ হোটেলের পেছন দিকে একটা নিরিবিলি জায়গায় তাদের আসর বসবে। চন্দ্রাকে বলেছিল, তুই ওখানে চলে আয় না।

চন্দ্রা বলেছিল, তুই যা। তোরা গিয়ে বোস। আমি একটু পরে জয়েন করব।

পল্লবের জন্য অন্যরা অপেক্ষা করছিল, সে আর দাঁড়ায়নি।

চন্দ্রাকে জোর করে সেই নৌকো থেকে নামানো কিংবা কোনও বিপদের সম্ভাবনার কথা তার মাথাতেই আসেনি। ওড়িশা পুলিশ এখনও প্রত্যেক দিন পল্লবকে জেরায় জেরায় নাজেহাল করছে।

চন্দ্রার অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা মাঝরাত্তিরের আগে কারুর খেয়ালই হয়নি।

রাত্তিরেও কিছু কিছু শুটিং ছিল। ইউনিটের সবাই খেতে বসেছিল রাত সাড়ে বারোটায়। তখন দু এক জন জিজ্ঞেস করেছিল, চন্দ্রা কোথায়?

চন্দ্রা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে সুনেত্রা তার ঘরেও খুঁজে দেখতে গিয়েছিল। না পেয়ে ঠোঁট উলটেছে। ইউনিটের অন্য অনেকে মুচকি হেসেছে। একটি যুবতী মেয়ের গতিবিধি সম্পর্কে অনেকেরই মাথায় রসালো চিন্তা আসে। চন্দ্রার বয়সি অভিনেত্রীদের সঙ্গে অনেক সময় তাদের মা কিংবা ভাই-বোন কেউ আসে পাহারা দেবার জন্য। চন্দ্রা সঙ্গে সে-রকম কেউ নেই। সুতরাং সকলে ধরেই নিয়েছিল, চন্দ্রা হোটেল ছেড়ে গোপালপুরের অন্য কোনও বাড়িতে রাত কাটাতে গেছে। পল্লব-সুনেত্রার মাথায় আমার নামটাও ঝিলিক দিয়েছিল নিশ্চিত।

পরদিন সকাল ন'টায় সন্তোষ মজুমদার এসেছিলেন আমার কাছে। তারও দু'ঘণ্টা বাদে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। চন্দ্রার ঘরে তার ব্যবহারের জিনিসপত্র, এমনকী সোনার গয়না ও টাকাকড়িও পড়ে আছে, এ-সব ছেড়ে চন্দ্রা নিশ্চিত একা একা কোথাও চলে যাবে না।

পল্লবের পর চন্দ্রাকে আর কেউ দেখেনি, অন্তত আর কেউ সে-রকম কিছু স্বীকার করেনি, সুতরাং চন্দ্রা সমুদ্রে ভেসে গেছে, এটাই হল একমাত্র থিয়োরি।

দরজা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়লাম। এখন সমুদ্রের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সমুদ্রের শব্দ আমার কখনও একঘেয়ে লাগে না। আসলে গাড়ি, ট্রেন, কলকারখানা, এই সব মেকানিক্যাল শব্দে মানুষ এখনও অভ্যস্ত হয়নি, এখনও কানে পীড়া দেয়, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব শব্দ আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে।

আমার একা থাকার অভ্যেস আছে। ছেলেবেলায় আমি ইচ্ছে করে ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে গেছি। জঙ্গলের মধ্যে ডাকবাংলোয় দিনের পর দিন থেকেছি একা। গোপালপুরেও তো বেশ কয়েকটা দিন হয়ে গেল। এক-এক রাতে ঘুম আসতে চায় না। তাতেও আমার কোনও অসুবিধে নেই। একটা পুরো রাত না ঘুমোলেও মানুষের কিছু যায়-আসে না। এক রাত না ঘুমোলে পরের রাতে শরীর ঠিক ঘুম আদায় করে নেবে।

ঘুম না এলে, ছটফট করার বদলে আমি বই পড়ি। একটু কঠিন ধরনের বই হলেই সুবিধে। এক সময় চোখ টেনে আসবেই।

জানালায় একটা শব্দ হতেই আমি বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বুকের মধ্যে জয়ঢাকের মতো দমাস দমাস শব্দ হচ্ছে।

নিজের ওপর অসম্ভব রাগ।

এটা কী ব্যাপার, আমি ভয় পাচ্ছি কেন শুধু শুধু! আমার ঠিক পায়ের কাছে জানালাটার একটা কপাট আলগা। মাঝে মাঝে যে এ-রকম বন্ধ হয়ে যায়, তা তো আমি জানিই। জানলাটা পুরো বন্ধ করে দিলে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফ্যানের হাওয়ার বদলে সমুদ্রের হাওয়া খাবার জন্যই তো এখানে আসা।

আজ সেই জানালার আওয়াজে এমন বুক কাঁপার কী আছে?

আজ সমুদ্রের ধারে সন্ধেবেলা নৌকোর ওপর বসা সেই রহস্যময় তরুণীটির কথা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। হয়তো কিছু রহস্য নেই, এমনিই একটি সাধারণ মেয়ে। বাঁধা নৌকোর ওপর উঠে একটুখানি বসা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। চন্দ্রার সঙ্গে যে মিলে গেছে, সেটাও কাকতালীয় হতে পারে।

কিন্তু মেয়েটি কে? ফিল্ম ইউনিটের কেউ না, ওদের সবাইকেই মোটামুটি চিনে গেছি। তাছাড়া মেয়েটি পাম বিচ হোটেলের দিকেও গেল না। অন্য কোনও টুরিস্ট হতে পারে। কিন্তু ওই বয়েসি কোনও মেয়ে কি একা আসে? চন্দ্রার ঘটনা কিছুই শোনেনি!

আমার যে মনে হয়েছিল, ওই নীল শাড়ি পরা মেয়েটি সমুদ্রের জলে নেমে মিলিয়ে গেল, এ-কথা আমার বন্ধু-বান্ধবেরা শুনলে হাসবে। অথচ মনে হয়েছিল, তা-ও ঠিক। এবং এখন এ-ও জানি, ও-রকম কিছু হতেই পারে না।

আবার জানলাটা বন্ধ হল, আবার আমার বুক কাঁপল। এ তো দেখছি মহা জ্বালা! আমার বুকের মধ্যে কোথাও খানিকটা ভয় জমে আছে। এটা তাড়ানো দরকার।

প্রথমে মনে হল, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল।

জানলার ধারে এসে আমি সন্তর্পণে বাইরে তাকালাম। কেন যে মনে হচ্ছে, ঠিক বাইরেই কারুকে দেখতে পাব।

দুর ছাই, মানুষের আত্মা-ফাত্মা কিছু নেই, চন্দ্রা আর কোনও দিনই ফিরে আসবে না। চন্দ্রা সঙ্গে আমার কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। চন্দ্রা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আমার হয়তো কখনও আর দেখা হত না। চন্দ্রা অমন ভাবে সমুদ্রে চলে গেছে বলেই সে প্রায় সর্বক্ষণ আমার মন জুড়ে আছে। শুধু আমার নয়, আরও অনেকের।

বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছে, ঢেউয়ের শব্দও খুব বেশি। বেলাভূমি একেবারে শুনশান। জানলা বন্ধ করার বদলে আমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে চটি গলিয়ে।

ভয় কাটাতে হলে এখন এই রাত্রির নির্জনতায় কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসা দরকার।

.

০৬.

রবীনবাবুর কথাই ঠিক, এরা পুরোদমে আবার শুটিং শুরু করে দিয়েছে। সকাল থেকেই শুনতে পাচ্ছি বেশ হট্টগোল।

আমার বাড়ির বেশ কাছাকাছি একটা খড়ের ঘরের সেট বানিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ওখানে ঘর দিয়ে কী হবে তা কে জানে! বালির ওপর বসানো হয়েছে ট্রলি, এ-দিকে ও-দিকে অনেকগুলি রিফ্লেক্টের, আজ সারা দিনই শুটিং চলবে মনে হয়।

জানলা দিয়ে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখেই ঠিক করলাম, আজ আর ও-দিকে যাবই না। চন্দ্রা নেই বলেই এই ফিল্মটার বাপারে আমার কেমন যেন একটা বিদ্বেষ জন্মে গেছে। অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার, প্রায় পঞ্চাশ ভাগের কাজ আগেই হয়ে গেছে। এখন এ ফিল্ম শেষ না করে ওদের উপায় নেই, তা ঠিক, কিন্তু একটি মেয়ে এমনি এমনি হঠাৎ হারিয়ে গেল, তার চিহ্ন কোথাও থাকবে না?

চন্দ্রার ভূমিকাটা কী হবে? বাকিটা হয়তো বাদই দিয়ে দেবে। এই সব গাঁজাখুরি গল্পের তো কোনও মা-বাপ নেই, যে-কোনও চরিত্র যে-কোনও জায়গায় হারিয়ে যেতে পারে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে লাগলাম।

এগারোটা আন্দাজ মনে হল, এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। আবার বাড়িতে চা-তৈরির ব্যবস্থাও নেই। সকালের চা-ব্রেকফাস্ট পাশের গেস্ট হাউস থেকেই দিয়ে যায়। দ্বিতীয় বার নিজে গিয়ে চাইতে হয়। তেলেঙ্গি মেয়েটি একটু আগে ঘর মুছছিল, সে চলে গেল নাকি? তাকে দিয়ে আনানো যেতে পারে চা।

মেয়েটি চলেই গেছে। আমাকেই উঠতে হল।

বাইরে বেরুতেই প্রতিমার সঙ্গে দেখা! আর এক জন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, আমি সামান্য সৌজন্যের হাসি দিয়ে চলে গেলাম গেস্ট হাউসের দিকে।

এদের ডাইনিং রুমে পাঁচ-সাত জন নারী-পুরুষ বসে আছে, কেউ কেউ চায়ের বদলে বিয়ার খাচ্ছে। দু'জন মুখচেনা, কিন্তু এখন কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে রাখলাম। একটু কান পাতলেই বোঝা যায়, অন্য সবাই চন্দ্রার বিষয়েই আলোচনা করছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম চা শেষ করে। ওদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, চন্দ্রার বাবা আর ছোট বোন এসে পৌঁছেছে গত কাল, চন্দ্রার মা নেই। চন্দ্রার বাবা নাকি কান্নাকাটি করছেন খুব। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করে নিয়েছি, কিছুতেই চন্দ্রার বাবার সামনে পড়তে চাই না।

একটা ভাঙা বাড়ির সামনে প্রতিমা এখনও কথা বলছেন অচেনা ব্যক্তিটির সঙ্গে। এবারও আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, কোনও কথা হল না, আমি ঢুকে গেলাম নিজের বাড়িতে।

মিনিট পাঁচেক পরেই প্রতিমা আমার দরজায় উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, আসতে পারি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললাম, আসুন, আসুন। রবীনবাবু কোথায়?

প্রতিমা বললেন, ও শুটিং দেখতে গেছে। আপনি গেলেন না?

আমি হেসে দুদিকে ঘাড় নাড়লাম।

প্রতিমা একটা চেয়ারে বসে বললেন, আজ চড়া রোদ। এর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে শুটিং দেখা, খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। রবীন গেছে, আমার মনে হয়, আরও কিছু খবরটবর জোগাড় করার আশায়। আসলে পুলিশ তো! ওর এখনও ধারণা, এটা আত্মহত্যা নয়, এর মধ্যে কিছু ফাউল প্লে আছে।

আমি বললাম, রবীনবাবু যদি মিস্ট্রি সলভ করতে পারেন তাহলে দারুণ ব্যাপার হয়। এখানকার পুলিশ তো কোনও খেই পাচ্ছে না।

প্রতিমা হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বললেন, অনেক দিন আগে জীবন যে-রকম নামে একটা বাংলা ছবি হয়েছিল, তার কাহিনিটা আপনার লেখা?

আমি বেশ তীব্র চোখে প্রতিমার দিকে তাকালাম। এই প্রসঙ্গটা কেউ তুললেই আমার রাগ এসে যায়, এত কাল বাদেও।

আমি বললাম, আমি কখনও কোনও সিনেমার কাহিনি লিখি না। আমার লেখা গল্প-উপন্যাস থেকে মাঝে মাঝে কেউ ফিল্ম করেন। জীবন যে-রকম' আমার একটা উপন্যাস, সেটা অবলম্বন করে একটা বাংলা ছবি হয়েছিল। সে-ছবি আমি নিজে অবশ্য দেখিনি। অন্যদের মুখে শুনেছি। সে-ছবি দেখলে আমার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের চেনাই যায় না।

প্রতিমা বললেন, আমি যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, ওকে আপনি চেনেন?

আমি বললাম, না!

প্রতিমা বললেন, আমি ইচ্ছে করেই তখন আপনাকে ডাকিনি। ওরনাম সুগত মজুমদার। একটি সিনেমা পত্রিকার রিপোর্টার। আপনাকে পেলে ছাড়ত না, অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাজর

ভ্যাজর করত। ওই ভদ্রলোকের বোন আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত, সেই সূত্রে চেনা। তবে আপনাকে এসে ধরবে ঠিকই।

আমি বললাম, আমি এবার কেটে পড়ব ভাবছি।

প্রতিমা বললেন, ওই সুগতই জীবন যে-রকমে'র প্রসঙ্গ তুলল। আপনার লেখা গল্প, তা আমার খেয়াল ছিল না। সেই ছবিরও শুটিঙের সময় জলে ডুবে কেয়া চক্রবর্তী...সেই সময় খুব তোলপাড় হয়েছিল ঘটনাটা নিয়ে। এখন আবার কেউ কেউ সেই প্রসঙ্গটা টানবেই। প্রায় একই রকম ব্যাপার তো!

আমি ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, কেয়া চক্রবর্তীর ঘটনাটা বাংলা সিনেমার একটা কলঙ্ক। আমাদের থিয়েটার জগতের কী বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, বলুন তো! কেয়া বাংলা মঞ্চে ইদানীংকার সব চেয়ে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, শুধু তাই নয়, গ্রুপ থিয়েটারের জন্য সে ছিল ডেডিকেটেড। কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। সেই কেয়াকে কত তুচ্ছ কারণে প্রাণ দিতে হল। একটা রাবিশ বাংলা সিনেমার জন্য।

প্রতিমা সামান্য হেসে বললেন, আপনারই লেখা কাহিনি, তবু আপনি রাবিশ বললেন?

আমার উপন্যাসটাকে কেটে, ছিঁড়ে ওলোট-পালোট করে যা খুশি করেছে। কাহিনির নায়ক-নায়িকা পর্যন্ত বদলে গেছে।

সিনেমার লোকরা ইচ্ছে মতো এ-রকম বদলাতে পারে, আপনারা কিছু বলেন না?

আমাদের কথা কি ওরা শোনে?

আপনারা আপত্তি করতে পারেন না?

মৌখিক আপত্তি গ্রাহ্যই করে না। অনেক সময় সিনেমার লোকেরা গল্পের রাইট কিনে সেই যে উধাও হয়, আর কোনও যোগাযোগই রাখে না লেখকের সঙ্গে। তাছাড়া কন্ট্রাক্ট

ফর্মে এক জায়গায় লেখা থাকে যে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য কিছু কিছু পরবির্তন-পরিবর্জন করা যাবে। ওরা সুযোগটা নেয়।

আমাদের ধারণা, লেখকরা টাকার জন্য আজে বাজে সিনেমার জন্যও কাহিনি বিক্রি করে দেন।

বাংলা সিনেমার জন্য কী সামান্য টাকা পাওয়া যায় তা তো আপনারা জানেন না। অনেক সময় চুক্তিতে যা লেখা থাকে, সেটাও পুরো পাওয়া যায় না।

কেয়ার ঠিক কী হয়েছিল? দুর্ঘটনা, না কেউ ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিল?

মামলা-টামলা হয়েছিল শুনেছি, শেষ পর্যন্ত কেউ শাস্তি পেয়েছিল কি না জানি না। সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, ওই জীবন যে-রকমে যে-ভূমিকায় কেয়াকে মরতে হল, সেই ভূমিকাটা আমার লেখাই নয়, উপন্যাসে ও-রকম চরিত্রই নেই। সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেবার জন্য চিত্রনাট্যে একটি অন্ধ মেয়ে আমদানি করা হয়েছিল, গল্পের সঙ্গে তার বিশেষ যোগই নেই।

ওই রকম এলেবেলে ভূমিকা নিতে কেয়া রাজি হয়েছিল কেন?

গ্রুপ থিয়েটারের সেই সময়টা ছিল খুব স্ট্রাগলিং পিরিয়ড। ওরা অভিনয়ের জন্য ভাল হল পেত না। নান্দীকার গ্রুপকে বোধহয় সেই সময় রঙ্গনা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। সেই জন্যই কেয়া, অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ এরা ঠিক করেছিল সিনেমাতে ছোটখাটো অভিনয় করে টাকা তুলে নিজস্ব একটা রঙ্গমঞ্চ বানাবে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অত বড় এক জন অভিনেতাকেও কত বাজে সিনেমায় অভিনয় করতে হয়েছে, মনে নেই?

কেয়া কি ইচ্ছে করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল?

সেটা আমি কী করে জানব, বলুন! সুন্দরবনের দিককার নদীগুলো সাংঘাতিক, ওখানে কেউ স্নানই করতে নামে না, সেখানে ঝাঁপ দেবার কোনও মানে হয়? অন্য কতভাবে দেখানো যেত। জলে ঝাঁপ দিলেও জাল-টাল পেতে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

কেয়া আত্মহত্যা করেছে, এ-রকম একটা কথাও উঠেছিল না?

অসম্ভব! কেয়াকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনতাম। ও-রকম তেজী, বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। সব সময় সে উৎসাহে টগবগ করত। সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, দুর্ঘটনা হোক বা যাই-ই হোক, কত অকিঞ্চিৎকর একটা কারণে ও-রকম এক জন প্রতিভাময়ী মেয়েকে প্রাণ দিতে হল। কী নিদারুণ অপচয়! ছি ছি ছি ছি, কী বিরাট অন্যায়।

আপনি তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন?

এখনও পাই। কেয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে।

কেয়া আর চন্দ্রা, চন্দ্রা অবশ্য তেমন কিছু বড় অভিনেত্রী নয়, তবু তো একটা সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণ, সবেমাত্র শুরু হয়েছিল ওর যৌবন ও কেরিয়ার...। নেটালি উড অবশ্য পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছিল, সিনেমা জগত থেকে তার আর বিশেষ কিছু পাবার ছিল না।

চন্দ্রা কি নেটালি উডের ঘটনাটা জানত?

চন্দ্রার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি। তার মনের কথা আমি কী করে জানব বলুন। তবে, আমাদের চেয়ে যারা দশ-পনেরো বছরের ছোট, তারা হলিউডের ওইসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রায় চেনেই না বলতে গেলে, গ্রেগরি পেক-এর জন্য কি আর এখনকার মেয়েদের বুক কাঁপে? আমার দিদির মেয়ে, তার একুশ বছর বয়েস, সে রোনালড কোলম্যান কিংবা ইনগ্রিড বার্গম্যানের নামই শোনেনি। ওদের ফিল্ম তো আজকাল পাওয়াই যায় না! অবশ্য ভি সি আর-এর দৌলতে এ-সব ফিল্ম আবার কিছু কিছু ফিরে

আসছে, কিন্তু ওই সব স্টার সম্পর্কে তেমন কৌতূহল কিংবা উন্মাদনা তো আর হবে না। আমি এবার উঠি। মেয়েটা একলা রয়েছে।

আপনার মেয়ে খুব পড়ুয়া, সবসময় ওকে বই পড়তে দেখি।

হ্যাঁ, গল্পের বই পড়তেই বেশি ভালবাসে। ছোটবেলায় যারা সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, অবন ঠাকুর পড়ে না, তাদের সম্পর্কে আমার যা মায়া হয়।

প্রতিমা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রতিমার স্বভাবে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যাতে ওঁর সঙ্গে ঠিক যেন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করা যায় না।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, আপনাকে একটা খবর দিই। এটা আমার স্বামীই খুঁজে বার করেছে। সুনেত্রার সঙ্গে চন্দ্রার একদিন বেশ বিরাট ধরনের ঝগড়া হয়েছিল। এটা আপনি শুনেছেন?

আমি বললাম, না তো! ওদের দু'জনের তো বেশ ভাবই মনে হত।

প্রতিমা বললেন, এর আগের একটা ছবির শুটিং হয়েছিল এলাহাবাদে। তাতে চন্দ্রা ছিল, পল্লবও সেই ছবিতে ক্যামেরার কাজ করেছিল। সুনেত্রা সেবার এলাহাবাদ যায়নি। পল্লব প্রত্যেক দিনই বেশি ড্রিঙ্ক করে, খানিক বাদে তার ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে না। এলাহাবাদে সে নাকি চন্দ্রার সঙ্গে অ্যাফেয়ার করার চেষ্টা করেছিল। চন্দ্রা তখন জানত না পল্লব বিবাহিত। সেই ঘটনা সুনেত্রা এখানে এসে শুনেছে।

কে বলল?

ওদেরই ইউনিটের অন্য কেউ। এই সব কথা জানিয়ে দিয়ে এক ধরনের লোক খুব আনন্দ পায়। তার ফলে ব্যাপারটা আর একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল না?

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রতিমা আবার বললেন, পল্লবই চন্দ্রাকে শেষ দেখেছিল। তার সঙ্গে চন্দ্রার কী কথা হয়েছে, কেউ জানেনা। চন্দ্রা সাঁতার জানত না। পল্লব নৌকোর দড়ি খুলে নৌকোটা সমুদ্রের মধ্যে যদি ঠেলে দিয়ে থাকে..সেটা অসম্ভব কিছুনা।

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

প্রতিমা দরজার বাইরে গিয়ে আবার বললেন, আমার পুলিশ স্বামীটির ধারণা, সেক্স অ্যাঙ্গেলটা খুব ইমপর্টেন্ট। যে-সব মেয়ে খুন হয়, তাদের অধিকাংশেরই প্রাণ যায় পুরুষদের বিকৃত যৌন তাড়নায়।

প্রতিমার মুখে সেক্স কথাটা কেমন যেন বেমানান লাগে।

ঘটনাটা ক্রমশই যেন একটা রোমহর্ষক রহস্য কাহিনির দিকে যাচ্ছে। আমার হাসি পেল এই ভেবে যে, এই কাহিনিতে আমি নিজেও একটা ছোটখাটো চরিত্র।

.

০৭.

দুপুরবেলা আকাশ কাঁপিয়ে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে জাগিয়ে দিল আমাকে। ধড়মড় করে উঠে জানলা বন্ধ করতে আমার ইচ্ছে হল না। ভিজুক না বিছানাটা। এমন কিছু ক্ষতি হবে না। শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম বিদ্যুতের লকলকে রেখা।

মিনিট পাঁচেকের বেশি অবশ্য শুয়ে থাকা যায় না। ভেতরের সাবধানী মনটা বলে ওঠে, বিছানা একেবারে জবজবে ভিজে গেলে রাত্তিরে শোবে কী করে? এরমধ্যেই চাদর-টাদর বেশ ভিজে গেছে।

একা থাকার এই মজা। কলকাতায় নিজের বাড়িতে কি এক মিনিটও এমন বৃষ্টির মধ্যে জানলা খুলে শুয়ে থাকতে পারতাম? স্বাতী এসে বকুনি দিত।

এখানে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ইচ্ছে মতো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। চায়ের কাপে ছাই ঝাড়লে আপত্তি করার কেউ নেই। সদর দরজাটা বন্ধ থাকলে পা-জামার দড়ি একেবারে আলগা করে শুয়ে থাকা যায়। বাথরুম থেকে স্নান সেরে আমি সোজা উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসি। কয়েক দিনের জন্য এই একটা অন্য রকম জীবন।

উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার সামনে।

ফিল্ম ইউনিটের লোকের ছোটাছুটি করছে। বৃষ্টি ও ঝড় এসে পড়েছে একেবারে জানান না দিয়ে। ক্যামেরার ওপর কম্বল চাপা দিয়ে কাঁধে করে দৌড়াচ্ছে পল্লব, বড় বড় রিফ্লেক্টরগুলো সরানো হচ্ছে তাড়াতাড়ি। খড়ের ঘরের যে-সেটটা ওরা বানিয়েছিল, সেটা হেলে পড়েছে ঝড়ের ধাক্কায়।

আজ আর শুটিং হবার আশা নেই।

এতে আমার আনন্দ হচ্ছে কেন? এক-এক দিন শুটিং বন্ধ হয়ে গেলেই অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যায়। অপরের ক্ষতি দেখে কেন আমার এই বিকৃত উল্লাস? না, এদের লাভ-লোকসানের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তবু, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে এই রকম একটা ভাব আমার মনের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। লোকজনের ছুটোছুটি দেখতে মজাই লাগছে বেশ।

সমুদ্রের ওপর অজস্র রুমালের মতো উড়ছে বৃষ্টি।

এক সময় সমস্ত বেলাভূমি জনশূন্য হয়ে গেল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমার গেঞ্জি-পাজামা পরা সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, আমি নিমগ্ন হয়ে দেখছি শূন্যতা। ঠিক শূন্যতা নয়, বৃষ্টি যেন জীবন্ত প্রাণী। এখন এই সমুদ্রকে নিয়ে বৃষ্টির খেলা করার সময়।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার একটি দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠল। একটা লাল রঙের ছাতা মাথায় দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি যুবতী।

সেই মুহূর্তে আমি এক লক্ষ টাকা বাজি ফেলে বলতে পারতাম, ওই নারীটি নিশ্চয়ই চন্দ্রা। ঠিক চন্দ্রার মতো হাঁটার ভঙ্গি, তার মুখখানা যদিও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবু চন্দ্রারই মতো, এই লাল ছাতা মাথায় দিয়ে আমি চন্দ্রাকে ঠিক এই রকমভাবে হাঁটতে দেখেছি।

তবে শুধু এক মুহূর্তের জন্যই আমার এ-রকম মনে হয়। পরের মুহূর্তেই আমি নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বলি, দিনে-দুপুরে ভূত দেখছ নাকি, সুনীল?

এমনও তো হতে পারে, চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া গেছে! সে ফিরে এসেছে কোনও জায়গা থেকে! তাহলে কি রবীনবাবু তখনি এসে সে-খবর আমাকে জানাতেন না?

মেয়েটি আমার চোখের আড়ালে চলে যেতেই আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। প্রকৃত ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে। আমার কি দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে? চন্দ্রার মতো অন্য এক জনকে আমি দেখছি কেন?

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

আমার এই বাড়িটার পেছন দিকেই একটা দেওয়াল, সেখানে বালি জমতে জমতে অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। অনেকটা খাড়া মতো বালির স্তূপ। সেখান থেকেই একটা লাফ দিলাম আমি। কেউ তো দেখছে না, একটু ছেলেমানুষি করলেই-বা ক্ষতি কী?

লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি একটু দূরে চলে গেছে, সে যাচ্ছে পাম বিচ হোটেলের দিকে। এখনও তাকে চন্দ্রাই মনে হচ্ছে আমার। যে যা-ই মনে করুক, একবার ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর মুখ দেখে, ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতেই হবে।

ঝড় থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে সমানে। বিচে আর কেউ নেই। আমি ছাতা আনিনি, সারা গা এমনিতেই ভেজা। দৌড়ে না গেলে মেয়েটিকে ধরা যাবে না।

অন্য বাড়িগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কোনও বারান্দাতেই কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দিনেরবেলা অনেকেই জেগে আছে, জানলা দিয়ে কেউ কেউ আমাকে দৌড়তে দেখতে পেয়ে যেতে পারে। একটা মেয়ের পেছনে আমি ছুটছি? মন্দ কী, মেয়েদের পেছনে ছোটা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

একটু জোরে পা চালাতেই পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এক জন লোক। মাথায় কালো ছাতা। চেঁচিয়ে ডাকল, ও সুনীলদা, একবার শুনুন!

সকালবেলা প্রতিমা এর সঙ্গেই কথা বলছিলেন। সিনেমার কাগজের লোক।

সে এসে আমার সামনেটা জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমায় চিনতে পারছেন, সুনীলদা? আমার নাম সুগত মজুমদার। সত্যজিৎ রায়ের ঘরে-বাইরে ছবির প্রিভিউয়ের দিনে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনি আপনার পকেট থেকে আমাকে একটা সিগারেট দিয়েছিলেন। কোথায় যাচ্ছেন, পাম বিচে? চলুন, আমিও ওই দিকেই যাব, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

ভিজে গায়ে, গেঞ্জি-পাজামা পরে আমি যাব পাম বিচ হোটেলে? কিন্তু আমি অন্য কোথায় যাচ্ছি, সেকথাও কি বলা যায়?

সুগত আবার বলল, দাদা, আপনার একটা ছোট্ট ইন্টারভিউ নেব।

আমি চিবিয়ে বললাম, এই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেই ইন্টারভিউ হবে বুঝি?

সুগত বললো, না না, মানে, আপনি যখন সময় দেবেন। চলুন ওদের হোটলে গিয়ে বসা যাক। আজ তো শুটিং প্যাক আপ হয়ে গেছে, ওখানে আড্ডা জমবে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি ওদের হোটেলে যাচ্ছি না।

লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে। একবার সে নিচু হয়ে বালি থেকে একটা কিছু কুড়াল। হয়তো ঝিনুক। দূর থেকেও ওকে ঠিক চন্দ্রা বলেই মনে হচ্ছে। আর একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে যাবে। কিছুতেই কি ওর কাছে গিয়ে মুখখানা দেখা যাবে না? আগের দিন সন্ধেবেলা একেই কি দেখেছিলাম?

সুগতকে যে কী অজুহাত দেব, তা মনেই এল না। ওকে এড়িয়ে কী করে ছুটে যাই মেয়েটির কাছে? তাহলে সুগত নিশ্চয়ই মনে মনে একটা রসালো গল্প বানিয়ে নেবে। কাগজে একটা কিছু লিখে দিলেই হল। গোপালপুরে সমুদ্রের ধারে দুপুরবেলায় বৃষ্টির মধ্যে আমি একটি মেয়ের পেছনে ছুটোছুটি করছি।

সুগত জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সুনীলদা, কেয়া চক্রবর্তীর যখন অ্যাকসিডেন্টটা হয়, তখন, মানে, জীবন যে-রকম'-এর শুটিঙের সেই দিনে আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

আমি গর্জন করে বলে উঠলাম, না!

তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম নিজের বাড়ির দিকে।

.

০৮.

বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম পনেরো দিনের জন্য, আর ছ' দিন বাকি আছে। কিন্তু আমার আর এখানে মন টিকছে না। নির্জনতার সুখ উপভোগ করার আর কোনও আশা নেই। আগামীকালই তল্পি তল্পা গুটিয়ে সরে পড়ব ঠিক করে ফেললাম।

চন্দ্রা উধাও রহস্য নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাবার আগ্রহ নেই।

রবীনবাবু আর প্রতিমা অবশ্য এখনও নানা রকম থিয়োরি নিয়ে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা বেশ অসুবিধেতেও পড়েছেন রবীনবাবু।

এখানকার থানাটা ছোট। সাধারণ খুন-টুনের ব্যাপার হলে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু এক জন যুবতী অভিনেত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ অনেক কাগজেই ফলাও করে খবরটা ছাপা হয়েছে। ভুবনেশ্বর থেকে এসেছেন তিন জন পুলিশ অফিসার। এই রহস্যের কিনারা করার ভার ওড়িশার পুলিশ দফতরের। ওড়িশার অফিসারদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমাদের আলাপও হয়েছে, তাঁর নাম অর্জুন মহাপাত্র। বেশ দক্ষ অফিসার বলে মনে হয়। ব্যবহারও খুব ভদ্র।

তবে অর্জুন মহাপাত্র ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলেন না। আমরা ওড়িয়া ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারি, আমাদের বাংলাও স্থানীয় লোক ঠিক বুঝে নেয়। অন্যদের সঙ্গে ওড়িয়া-বাংলা মিলিয়ে-মিশিয়ে আলোচনা চালাতে কোনও অসুবিধে হয় না, কিন্তু অর্জুন মহাপাত্র খুবই ইংরিজিওয়ালা!

অর্জুনবাবু এখানে রবীনবাবুর উপস্থিতি খুব একটা পছন্দ করেননি। তার ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ওড়িশার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। রবীনবাবু যে এখানে ছুটিতে এসেছেন, তার অফিসিয়াল পজিশন নিয়ে তদন্ত করছেন না, এটা অর্জুন মহাপাত্র ঠিক বিশ্বাস করছেন না। তিনি মুখে অবশ্য বলছেন, অফ কোর্স আপনার মতো এক জন অভিজ্ঞ অফিসারের পরামর্শ ও সাহায্য পেলে আমরা খুশিই হব।

অর্জুন মহাপাত্র ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা, চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং চঞ্চল। সকলের সঙ্গেই তিনি ভাল ব্যবহার করেন, অথচ সকলকেই তিনি সন্দেহ করেন বলে মনে হয়। টিপিক্যাল ডিটেকটিভ। আমার ওপরেও তার কোনও সন্দেহ আছে কি না কে জানে!

চন্দ্রা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আমার বাড়িতে, সে দিন ঠিক কী কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে তিনি আমাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট জেরা করলেন, সঙ্গে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার।

অর্জুন মহাপাত্রই বললেন যে, ম্যাড্রাস থেকে আরও দু' জন ডুবুরি এসেছে, তারা সন্ধেবেলাতেই জলে নেমে পড়েছে।

আমার জবানবন্দি শেষ হবার পর আমি অর্জুনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ইচ্ছে করলে এখন গোপালপুর ছেড়ে চলে যেতে পারি? তাতে কোনও অসুবিধে আছে কি?

অর্জুনবাবু খুবই অবাক হয়ে বললেন, আপনি চলে যাবেন কি না, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? অফ কোর্স। আপনাকে হ্যারাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য খুবই দুঃখিত। আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, যদি সিচুয়েশানটা বুঝতে কিছু সাহায্য হয়। অফ কোর্স আপনি যে-কোনও সময় যেখানে খুশি যেতে পারেন।

অফ কোর্স অর্জুন মহাপাত্রের একটা মুদ্রাদোষ।

ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার বললেন, যদি খুব অসুবিধে না হয়, আরও দু' একটা দিন থেকে যান না। মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে এসে গল্প করে যাব। এই ব্যাপারটা সলভ করতে আর দুদিনের বেশি লাগবে না। অফ কোর্স আপনার যদি অন্য কোনও কাজ থাকে, তাহলে আটকাতে চাই না।

এটা ওঁর অনুরোধ না প্রচ্ছন্ন আদেশ, তা বোঝা গেল না।

আমি খানিকটা জেদের সঙ্গেই বললাম, নাঃ, কাল বিকেলেই আমি চলে যাব ঠিক করেছি। বেরহামপুর থেকে রাত্তিরের ট্রেন ধরব।

অর্জন মহাপাত্র এবারে আরও ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, তাহলে আমার গাড়ি আপনাকে বেরহামপুরের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। টিকিট কাটা আছে আপনার? নো প্রবলেম।

অর্জুন মহাপাত্র চলে যাবার মিনিট দশেক পর একটা গাড়ি এসে থামল আমার বাড়ির সামনে। সদর দরজা খোলা, ভেতরে ঢুকে এলেন সন্তোষ মজুমদার, তার সঙ্গে সুনেত্রা ও আরও দুই ব্যক্তি। সুনেত্রার মুখখানায় রাগ ও বিষণ্ণতা মাখা।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, উঠুন স্যার, পায়ে জুতো গলিয়ে নিন, একবার আমাদের হোটেলে চলুন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী ব্যাপার?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, চলুন না। একা একা বসে থাকেন, আমাদের জন্য একটু সময় দিতে পারবেন না? আমরা কি এতই খারাপ লোক?

আরে নাঃ, যাঃ কী বলছেন! হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসেই আমাকে যেতে বলছেন, কেন আবার কিছু ঘটেছে।

নতুন কিছু ঘটেনি। তবে আমাদের ইউনিটের লোকজন ক্রমশ খেপে যাচ্ছে। সবাইকে আর সামলানো যাচ্ছে না। ওড়িশার পুলিশ আমাদের খুব হ্যারাস করছে।

তার মানে?

মহাপাত্র সাহেব অর্ডার দিয়েছেন যে, আমাদের ইউনিটের কোনও এক জন লোকও এখন গোপালপুরের বাইরে যেতে পারবে না। আচ্ছা ভাবুন তো, কী মুশকিলের ব্যাপার। ফিল্মের এত বড় ইউনিট, সবাই কি এক জায়গায় বেশিদিন পড়ে থাকে? অনবরত লোক যাতায়াত করে। যার দু'এক দিনের কাজ, সে কাজ শেষ হলেই চলে যায়। আর যে-দিন কাজ, তার আগের দিন আনানো হয়, ঠিক কি না? সবাইকে এক মাস ধরে হোটেলে রেখে খাওয়ালে যে করপোরেশানের বাজেট হয়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের প্রোডাকশানের জিনিসপত্র আনবার জন্য দুতিনজনকে প্রায় প্রত্যেকদিন কলকাতায় পাঠাতে হয়, সেসবও বন্ধ।

আমি সন্তোষবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। এটা ওঁদের পক্ষে একটা সত্যিকারের সমস্যা বটে, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে আমার তো কোনও হাত নেই!

সন্তোষ মজুমদার আবার বললেন, দেখুন, আমাদের মধ্যে একটা অত্যন্ত স্যাড ব্যাপার ঘটে গেছে। চন্দ্রা ফিল্ম লাইনে নতুন এলেও সবাই ওকে পছন্দ করত। ভাল মেয়ে, যথার্থ ভাল মেয়ে, ট্যালেন্ট ছিল, রাইজ করতে পারত। তার এই রকম হল, সেজন্য সবাই খুব জেনুইন দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কাজও তো করে যেতে হবে। আপনি তো জানেন স্যার, ফিল্ম প্রোডাকশান মানে একটা বৃহৎ যজ্ঞ। সময় নষ্ট করলেই হাজার হাজার টাকা ক্ষতি।

নিতান্ত কথার কথা হিসেবেই আমি বললাম, আজ তো সারা দিনই প্রায় বৃষ্টির জন্য শুটিং বন্ধ রইল।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, সেই জন্যই আজ সারা রাত আবার শুটিং সিডিউল রেখেছি। হোটেলের কাছাকাছিই হবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, নাইট ফর ডে কাজ হবে।

সন্তোষবাবু, আপনারা সারা রাত শুটিং করবেন, সেখানে আমি গিয়ে কী করব?

শুটিং দেখতে আপনাকে ডাকছি না। সে-সব শুরু হবে রাত দশটা থেকে। লাইটিং করতে, ট্রলি বসাতে অনেক সময় লেগে যাবে। তার আগে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত একটা গেট টুগেদারের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে একবার আপনাকে আসতেই হবে যে! পুলিশদের বলেছি, আরও দু'চার জন গণমান্য লোক আসছেন, সেখানে অর্জুন মহাপাত্রর কাছে আমাদের সমস্যাটা তুলব। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, শুধু একটু মরাল সাপোর্ট দেবেন। সামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, একবার চলুন।

অন্য দুই ভদ্রলোকের মধ্যে এক জন প্রোডাকশন ম্যানেজার ও অন্য জন সহ-পরিচালক, তারাও এমন পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন যে আর না বলা গেল না।

আমি বললাম, সাতটা বাজতে তো দেরি আছে, আমি যাচ্ছি আধ ঘণ্টা পরে।

সন্তোষবাবু বললেন, ঠিক আসবেন তো? গাড়ি পাঠাব?

আমি বললাম, না, হেঁটেই যাব। সারা দিন একটুও হাঁটা হয়নি সমুদ্রের ধারে।

হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠে সন্তোষ মজুমদার বললেন, জানেন, আজ দুপুর থেকে পল্লবকে থানায় ডিটেইন করে রেখেছে? আমরা এই মাত্র তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, দেখা করতেই দিল না। এ কি মগের মুল্লুক?

আমি তাকালাম সুনেত্রার দিকে।

সুনেত্রা অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনার বন্ধু রবীনবাবুই ওর নামে লাগিয়েছে।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, রবীনবাবু আর ওঁর স্ত্রীকেও গেট টুগেদারে ডেকেছি। তুই আবার ওঁদের সামনে কিছু বলে বসিসনা।

সুনেত্রা বলল, যদি ওরা পল্লবকে না ছাড়ে, পল্লবের ঘাড়ে মিথ্যে দোষ চাপায়, তাহলে আমি অনেক কিছু ফাঁস করে দেব। ওই রবীনবাবুকে আমি ছাড়ব না। উনি চন্দ্রার পিছনে অনেক দিন ধরে ঘুর ঘুর করছেন।

৯-১৩. সারা দিন বর্ষার পর

সারা দিন বর্ষার পর বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সমুদ্রের ধারে কিছু মানুষ রয়েছে আজ। এক জায়গায় পাঁচ-ছ'জন যুবক-যুবতীর একটি দল গান গাইছে এক সঙ্গে। এরা নতুন এসেছে মনে হয়।

আমি হাঁটছি খুব আস্তে আস্তে। কাল চলে যাব ঠিক করে ফেলার পর আজ সমুদ্রকে নতুন করে ভাল লাগছে যেন। কাল সকালে অন্তত দুতিন ঘণ্টা স্নান করতে হবে।

ঠিক চন্দ্রার মতো একটি নারীকে আমি দু'বার দেখেছি এই বেলাভূমিতে। সে কি আমার চোখের ভুল? দু'বারই যুবতীটি মিলিয়ে গেছে আমার চোখের সামনে থেকে। মিলিয়ে গেছে মানে অদৃশ্য হয়ে যায়নি, মেয়েটি রক্তমাংসের জীবন্ত নিশ্চিত, কিন্তু আমি তার মুখ দেখতে পাইনি ভাল করে। চন্দ্রার সঙ্গে এমনই মিল যে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

রবীনবাবু আর প্রতিমার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি খুলে বলতে পারিনি। ব্যাখ্যা করতে পারব না যে! প্রত্যেকেরই কিছু কিছু গোপন কথা থাকে।

সুনেত্রা বলে গেল, সে রবীনবাবু সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। রবীনবাবু যে চন্দ্রাকে আগে থেকে চিনতেন, সেকথা আমাকে জানাননি। সম্ভবত প্রতিমাও জানেন না।

দূরে দেখা যাচ্ছে আলোকোজ্জল হোটেলটি।

আজও এক জায়গায় বাঁধা আছে দুতিনটে নৌকো। এখান থেকেই একটা নৌকোয় চন্দ্রা মিলিয়ে গেছে সমুদ্রে। তার পরেও আর একটা নৌকোয় আমি বসে থাকতে দেখেছিলাম চন্দ্রার মতো এক রহস্যময়ী নারীকে। এটাই আমাকে সব চেয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

দুপুরবেলা লাল ছাতা মাথায় যে-মেয়েটি হেঁটে গেল, তাকে কি শুধু আমি একাই দেখেছি? যাঃ, এটা হতেই পারে না। এ-সব আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না, এ-রকম অভিজ্ঞতাও আমার আগে কখনও হয়নি।

দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছেন। এঁদের আগে দেখিনি। এরা বোধহয় চন্দ্রার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা কিছুই জানেন না।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত পল্লবকে অ্যারেস্ট করল? পল্লবের সঙ্গেই চন্দ্রার শেষ দেখা হয়েছিল, চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের আগে থেকেই কিছু একটা সম্পর্ক ছিল। সুতরাং পল্লবের ওপর প্রথম খানিকটা সন্দেহ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণত খুনের গল্পে দেখা যায়, প্রথমে যার ওপর সন্দেহ হয়, পাঠক বা যাকে খুনি বলে ধরে নেয়, সে আসলে নির্দোষ। ঘটনা হঠাৎ মোড় নেয় অন্য দিকে, আসল খুনি বেরিয়ে আসে।

এখানে পল্লবই যদি শেষ পর্যন্ত ভিলেন হয়, তাহলে ব্যাপারটা বড় সাদামাটা হয়ে যাবে। রবীনবাবু চন্দ্রাকে আগে থেকে চিনতেন, সেটা তার স্ত্রীর কাছেও গোপন করে গেছেন। সেই জন্যই কি চন্দ্রার কেসটা নিয়ে রবীনবাবু এতখানি ইনভলভড হয়ে পড়েছেন?

উলটো দিক থেকে হেঁটে আসছেন প্রতিমা আর তাঁর মেয়ে। প্রতিমার হাতে একটা টর্চ।

প্রতিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, বৃষ্টির পর আজ আকাশটা কী সুন্দর হয়েছে দেখেছেন? আজ জ্যোৎসাও উঠেছে তাড়াতাড়ি।

আমি এতক্ষণ ভাল করে আকাশ দেখিনি, অন্য এলেবেলে বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। একটু হেসে বললাম, কাল আমি চলে যাব, তাই আমার জন্য এত সুন্দর জ্যোৎসা ফুটেছে।

প্রতিমা বললেন, কালই যাবেন কেন, আর দু'এক দিন থাকুন। অন্তত শনিবার পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, শনিবার পর্যন্ত থেকে যান।

কেন, শনিবার স্পেশাল কিছু আছে?

আমার মেয়ের জন্মদিন। এখানেই সেলিব্রেট করব। আপনি থাকলে ভাল লাগবে।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নেড়ে বললাম, যদি না থাকি, আগে থেকেই হ্যাপি বার্থ ডে জানিয়ে রাখছি।

মেয়েটির হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। এখানে কোথায় ফুলের দোকান, আমি দেখিনি। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলগুলো কিনলেন?

প্রতিমা বললেন, না, কিনিনি। 'পেরলস' নামে যে বাড়িটা আছে, সেখানে টবে অনেকরকম ফুল হয়েছে। ওই বাড়ির এক মহিলা নিজে থেকেই দিলেন। আচ্ছা, আজকে আকাশের জ্যোৎস্না আর এই রজনীগন্ধা, এই নিয়ে কোন গানটা মনে পড়ে বলুন তো?

কেউ জিজ্ঞেস করলে তক্ষুনি কোনও গান বা কবিতা আমার মনে পড়ে না। ধাঁধার উত্তর দিতে আমি সবসময় ফেল করি। টিভির কুইজ প্রোগ্রামে অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েরা যখন শক্ত শক্ত প্রশ্নের উত্তর চটাস চটাস করে উত্তর দেয়, তখন তাদের প্রতি আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়।

আমি চুপ করে আছি দেখে প্রতিমা বললেন, পারছেন না? আপনাকে একটা ক্লু দিচ্ছি। গানটা 'উদয়ের পথে' ফিল্মে ছিল।

আমার চোখ কপালে উঠল। উদয়ের পথে' তো আমার প্রায় হামাগুড়ি বয়সের ছবি। সে-ছবি আমি দেখিনি, নাম শুনেছি মাত্র। প্রতিমাই-বা সেই সিনেমা দেখলেন কী করে!

ছোট মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

প্রতিমা বললেন, ওকে আমি এইমাত্র শেখালাম। খুকু, দু'লাইন শুনিয়ে দে তো।

মেয়েটি গেয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উঠলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো, চাঁদের হাসি...।

আমি বললাম, বাঃ, আপনার মেয়েরও তো বেশ ভাল গানের গলা।

প্রতিমা বললেন, আমাদের ওখানে একটু পরে চলে আসুন না। বারান্দায় বসে আড্ডা দেওয়া যাবে। ও কোথা থেকে একটা ভাল হুইস্কি জোগাড় করে এনেছে।

আমাকে যে পাম বিচ হোটেলে সিনেমা ইউনিট নেমন্তন্ন করেছে, সেটা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। বোঝাই যাচ্ছে, ওরা রবীন-প্রতিমাকে ডাকেনি। প্রতিমা অবশ্য নেমন্তন্ন পেলেও নিতেন না।

বললাম, দেখি, ওই দিকে এক জনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

প্রতিমা বললেন, হ্যাঁ, ঘুরে আসুন, একটু পরে আসুন। রবীনও কোথায় যেন বেরিয়েছে, খানিকক্ষণের মধ্যে ফিরবে নিশ্চয়ই।

প্রতিমা আবার এগিয়ে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

এই পরিবারটি বেশ চমৎকার। স্বামীটি ভদ্র, শিক্ষিত। প্রতিমাও বিদূষী এবং মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। মেয়েটিও বেশ ভাল হয়েছে, পড়াশুনোর দিকে খুব ঝোঁক। ওঁদের ছেলেও বেশ ব্রাইট শুনেছি।

সবাই এঁদের একটি আদর্শ, সুখী পরিবারই মনে করবে। কিন্তু প্রতিমার কোনও একটা গুরুতর অসুখ আছে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। রবীনবাবু ফিল্মের অভিনেত্রীদের সঙ্গে গোপনে ঘোরাঘুরি করেন। এই সব গোপন ব্যাপারগুলো না জানলেই ভাল হত।

চন্দ্রা যে-দিন অদৃশ্য হয়ে যায়, সে-দিনও আকাশে জ্যোৎসা ফিনকি দিচ্ছিল। চন্দ্রার স্বভাবটিও ছিল খুব রোমান্টিক ধরনের, সাহিত্যবোধ ছিল, কবিতা পড়েছে অনেক, সেই সব টানেই ও দেখা করতে গিয়েছিল আমার সঙ্গে। চন্দ্রা ফিল্ম লাইনে না এসে লেখিকা হবার চেষ্টা করল না কেন? তাহলে ওকে আমরা হারাতাম না।

.

১০.

পাম বিচ হোটেলের ভেতর দিয়ে দুটি লম্বা টানা বারান্দা। মাঝখানের চত্বরে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। এখানেই চেয়ার পেতে বসেছে অনেকে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমার প্রথমে মনে হল, চন্দ্রা থাকলে সেই ছুটে এসে আমাকে কোথাও বসাত। এই ইউনিটের লোকজনের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রার সঙ্গেই আমার বেশি আলাপ পরিচয় হয়েছিল। অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনেকেই লেখকদের বিশেষ পাত্তাই দেয় না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবশ্য বিশেষ দেখা যাচ্ছেনা এখানে। অচেনা লোকজনই বেশি। সন্তোষ মজুমদারকেও দেখতে পাচ্ছিনা, কেউ আমাকে অভ্যর্থনা করল না, আমার বেশ বোকা বোকা লাগতে লাগল। এখানে না এলেই ভাল হত। এখনই সরে পড়লে কেমন হয়?

আবার ধরা পড়ে গেলাম সুগত মজুমদারের হাতে। সে একটু দূর থেকে দু'হাত বাড়িয়ে এসে বলল, এই যে দাদা, আসুন, কোথায় বসবেন? ওই বারান্দার কোণটায় চলুন না, ওখানে দারুণ হাওয়া।

এখন সুগতকে আমার তেমন অপছন্দ হল না। আমাদের দুজনেরই কলম নিয়ে কারবার, এই মিলটা তো আছে, সুতরাং আমরা দুজনে পাশাপাশি বসতে পারি।

বারান্দার কোণে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে সুগত এক দৌড়ে গিয়ে আমার জন্য এক গেলাস হুইস্কি আনতে গেল। আমি চোখ বুলিয়ে দেখলাম, অর্জুন মহাপাত্র কিংবা এখানকার পুলিশের লোকজন কেউই এখনও আসেননি। তবে একজন ভদ্রলোককে ঘিরে অনেকে খাতির করছে, তার মুখের চাপা অহঙ্কারের ভাব দেখে মনে হয় কোনও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। কে যেন বলছিল, ওড়িশার হোম সেক্রেটারির গোপালপুরে বেড়াতে আসার কথা আছে।

সুগত ফিরে এসে বলল, দাদা, আর একটু বসুন। সিগারেট জোগাড় করে আনি। আমার প্যাকেটটা ভুলে ফেলে এসেছি।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আমার কাছে যথেষ্ট সিগারেট আছে। বোসো। তবে তোমাকে একটা কথা আগেই বলে রাখছি সুগত, তুমি জীবন যে-রকম'-এর প্রসঙ্গ আমার কাছে একদম তুলবে না।

সুগত এক গাল হেসে বলল, দুপুরবেলা আপনি অত রেগে গেলেন, বুঝতে পারিনি, আপনি ওই ব্যাপারে এত টাচি। না না, ওই প্রসঙ্গ আর তুলব না। কেয়া চক্রবর্তীর তো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, আর এখানে চন্দ্রার কেসটা তো স্পষ্ট মার্ডার।

আমি ভুরু তুলে বললাম, তাই নাকি! স্পষ্ট?

সুগত মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, চন্দ্রা সাঁতার জানত না। কেউ তাকে নৌকোসুদ্ধু জলে ঠেলে দিয়েছে।

নৌকো বাঁধা থাকে বালির অর্ধেকটা ওপরে।

জোয়ারের সময় জল বেড়ে যায়।

তা জানি। কিন্তু সমুদ্র তো হঠাৎ গভীর হয় না। অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাঁটুজল, বুকজল থাকে, সাঁতার না জেনেও কেউ নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে যেতে পারে।

কেউ যদি আগেই চন্দ্রাকে গলা মুচড়ে মেরে তারপর নৌকো সুষ্ঠু ঠেলে দেয়?

সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে তো!

পুলিশ অলরেডি প্রুভ করে ফেলেছে।

তাই নাকি?

পল্লবদত্তকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দিয়েছে জানেন না?

ওর নামে চার্জ এনেছে?

ইয়েস। মার্ডার চার্জ। আমি রিলায়েবল সোর্স থেকে জেনে এসেছি।

আমি সুগতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাংবাদিকদের অধিকাংশ খবরই বিশ্বাসযোগ্য হয়। না। অনেক সাংবাদিক একেবারে স্পটে গিয়ে যে-সব খবর বার করে আনে, সেগুলো আসলে অর্ধেক গুজব। পল্লব খানিকটা ফুর্তিবাজ ধরনের, বেশি মদ খায়, নারীঘটিত দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে খুনি বলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মানুষ চিনতে কি আমার এত ভুল হয়?

সঙ্গে সঙ্গে সুনেত্রার রাগী মুখটা মনে পড়ল। সে রবীনবাবু সম্পর্কে এখন কুৎসা ছড়াবে। পল্লব দত্তের তো যা হবার তা হবেই, এখন রবীনবাবুর জীবনেও নেমে আসবে অশান্তি। প্রতিমা কীভাবে গ্রহণ করবেন তার স্বামীর নামে ওই অভিযোগ?

আমার মনটা বেশ দমে গেল।

হোটেলের বাইরে ডান পাশটায় কিছু গাছপালার মধ্যে তীব্র আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর। অন্যমনস্ক ভাবে সে-দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কী হচ্ছে?

সুগত বলল, ওখানে শুটিঙের জন্য সেট পড়েছে। আজ হোল নাইট শুটিং হবে। সন্তোষবাবু তো বললেন, তিন দিনের মধ্যে আউটডোরের কাজ শেষ করে ফেলবেন।

এত তাড়াতাড়ি?

এরপর স্টুডিয়োতে কিছু কাজ আছে। আজ রাত্তিরে আপনি থাকবেন নাকি শুটিঙে?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়ালাম।

বাগানের দিক থেকে বারান্দায় উঠে এলেন সন্তোষ মজুমদার। আমাকে এখানে আসার জন্য অত ঝুলোঝুলি করেছিলেন বিকেলবেলা বাড়িতে গিয়ে, এখন আমাকে দেখতেই পেলেন না। চিন্তিত মুখে চলে গেলেন সামনের দিকে। পরিচালকদের অনেক কিছু সামলাতে হয়, তাদের মাথায় সব সময় দুশ্চিন্তার বোঝা।

সুগত বলল, এ ছবি সুপার হিট হবেই।

সে কী! তুমি আগে থেকেই কী করে বুঝলে?

ছবি যতই রদ্দি হোক, কত লাখ টাকার পাবলিসিটি পেয়ে গেল, বুঝছেন না? কলকাতার সমস্ত ডেইলি পেপারে ফার্স্ট পেজ রিপোর্ট বেরিয়েছে। চার লাস্ট ছবি বহু পাবলিক দেখতে আসবে। চন্দ্রা মার্ডারড হয়ে সন্তোষ মজুমদারের কিন্তু উপকারই করে গেল।

অনেক সাংবাদিক এই ধরনের সিনিক্যাল কথা বলে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। আমি কোনও মন্তব্য করলাম না।

সুগত আবার বলল, বাংলা ফিল্মে নায়িকার খুব অভাব। চন্দ্রার অনেক স্কোপ ছিল। আর দু'এক বছরের মধ্যে ওর হিরোইন হবার খুব চান্স ছিল। চন্দ্রা এ পর্যন্ত ঠিক ভাল রোল পায়নি। বেচারাকে নেগলেকট করা হচ্ছিল। কেন জানেন? ফিল্ম লাইনের লোকজনদের সঙ্গে চন্দ্রা যে ঠিক মতো মিশতে পারত না। বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ে, সেটাই ওর

ডিসকোয়ালিফিকেশান। পল্লব-ফল্লবের মতো বাজে টাইপের লোকরা জ্বালাতন করত ওকে। আমি চন্দ্রার জন্য গৌতম ঘোষকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যদি নেকস্ট ছবিতে নেয়।

হোটলের প্রবেশপথে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ। একসঙ্গে সাত-আট জনের একটি দল ঢুকল। প্রথমে চোখে পড়ে দীর্ঘকায় অর্জুন মহাপাত্রকে। সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা আরও দুজন অফিসার। তাদের পাশে রবীনবাবু এবং তার পেছনে পল্লব দত্ত।

হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই, পল্লবকে সঙ্গে করে এনেছেন ওঁরা। সুগতর খবর ভুল। এর মধ্যে পল্লবকে ভুবনেশ্বর নিয়ে যাওয়া, আবার সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

পল্লবের হাতে হাতকড়াও নেই, কেউ তাকে ধরেও রাখেনি। বরং তার মুখখানিতে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও তাতে খানিকটা খুশির ভাবও ঝিলিক দিচ্ছে।

আমি সুগতকে বললাম, ওই তো পল্লব ফিরে এসেছে।

সুগত চোখ বড় বড় করে, ফিরে এসেছে? বলেই এক লাফ দিয়ে চলে গেল সে-দিকে। কী জানি, আগের খবরটা এর আগেই সে তার পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা!

আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম, অর্জুন মহাপাত্র প্রথমে বড় সরকারি কর্মচারীটির কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বললেন, অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওঁদের। একটু পরে ওঁরা দু'জন শুধু সন্তোষ মজুমদারকে নিয়ে চলে গেলেন আড়ালে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ওখানে কোনও জরুরি কথাবার্তা চলছে।

উলটো দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুনেত্রা। সে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পল্লবের দিকে। কিন্তু নিজে থেকে এগিয়ে আসছে না। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পল্লব একবার সুনেত্রার দিকে হাত তুলল।

মিনিট পাঁচেক বাদে রবীনবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। এক জন বেয়ারা ট্রে-তে ড্রিঙ্কস সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, রবীনবাবু এক গেলাস বিয়ার তুলে নিয়ে এক চুমুকেই শেষ করলেন অর্ধেকটা।

তারপর খানিকটা হাঁপ ছেড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নতুন ডেভেলপমেন্ট কী হয়েছে, আপনি আন্দাজ করতে পেরেছেন?

আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললাম, না। পল্লবকে ছেড়ে দিয়েছে দেখছি।

শুধু ছেড়ে দেয়নি। পল্লবের ওপর থেকে সব সন্দেহও চলে গেছে। হি ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাবাভ বোর্ড।

কী করে সেটা প্রমাণ হল?

চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের দেখা হবার পরেও আর এক জন চন্দ্রাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে।

সত্যি? সেটা এত দিন জানা যায়নি? কে দেখেছে?

রবীনবাবু চেয়ারটা আরও কাছে টেনে এনে বললেন, সেই লোকটিকে আমি খুঁজে বার করেছি। কিন্তু সেই ক্রেডিটটা আমি নিতে চাই না। ওড়িশা পুলিশের ওপর এই কেসের দায়িত্ব, তারাই সলভ করেছে, এটাই সবাই জানবে। আমি শুধু লোকটাকে নিয়ে অর্জুন মহাপাত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, এবার আপনি জেরা করুন, ইটস ইয়োর বেবি।

লোকটি কে?

পল্লবকেই এখানকার পুলিশ মার্ডারার বলে ধরে নিচ্ছে দেখে আমার খটকা লেগেছিল। চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের ঝগড়াঝাটি হলেও ঝট করে সে তাকে খুন করবে কেন? খুনের মোটিভ আরও অনেক গভীর হয় সাধারণত। সেই জন্যই আমার মনে হল সামথিং মাস্ট

বি ডান। পল্লব নিজেই স্বীকার করেছে যে, চন্দ্রাকে সে নৌকোর ওপর বসে থাকতে দেখেছিল।

সে নিজে স্বীকার না করলে হয়তো একথাটা কেউ জানতেই পারত না।

মোস্ট প্রোবাবলি তাই হত। ফিল্ম ইউনিটের প্রত্যেককে, বিভিন্ন হোটেলের বোর্ডারদের, আপনাকে এবং আমাকেও পুলিশ এরপর জেরা করেছে যে আর কেউ সেই রাত্রে চন্দ্রাকে দেখেছিল কি না। কেউ দেখেনি কিংবা স্বীকার করেনি, তাই তো?

এ পর্যন্ত তাই ছিল।

আমরা পুলিশরা অত্যন্ত দায়সারা ভাবে কাজ করি। আরও অনেককে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। একটা নৌকোয় চন্দ্রা উধাও হয়েছে, নৌকো নিয়ে যাদের কাজকারবার।

নৌকোর মালিক কিছুই জানে না বলেছে। নৌকোটা ভাড়া দেওয়া হত, সেই নৌকোটাও তো এখনও উদ্ধার হয়নি।

পল্লবকে ওরা অ্যারেস্ট করছে দেখে আমার মনে হল, আর একটা খোঁজ করা দরকার। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা জেলেদের বস্তি আছে, চলে গেলাম সেখানে।

অত দূরের লোক এখানকার ঘটনা কী করে জানবে? সন্ধের পর জেলেরা তো কেউ এ-দিকে আসে না।

অনেক সময় ইমপ্রোববল জায়গা থেকেও মূল্যবান খবর পাওয়া যায়। আমি জেলেদের বস্তিতে গিয়ে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জনকে ইন্টারোগেট করেছি। নিজের দায়িত্বে। এর মধ্যে এদের ভাষা খানিকটা শিখে নিয়েছি। সেটা কাজে লেগে গেল। ওই জেলেরা তেলেগু আর ওড়িয়া মিশিয়ে একটা বিচিত্র ভাষা বলে। চেষ্টা করলে বোঝা যায়।

সেখানে এক জনকে পেলেন?

জানেন বোধহয় যে, এই জেলেরা খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের আগেই সমুদ্রে ভেসে পড়ে। অনেক দূরে চলে যায়। ফেরে সন্ধের সময়। কারুর কারুর ফিরতে রাত হয়ে যায়। আমি ওদের বস্তিতে গিয়ে দেখলাম, অধিকাংশ পুরুষমানুষই জাল আর নৌকো নিয়ে বেরিয়ে গেছে। রয়েছে শুধু মেয়েরা আর বাচ্চারা, আর কিছু বৃদ্ধ। অনেকগুলো বাড়ি ঘোরার পর এক বাড়িতে এক জনকে পাওয়া গেল, সে-ও প্রায় বৃদ্ধই, তবে কাজের ক্ষমতা আছে, এখনও মাছ ধরতে যায়। কিন্তু আজ সে যায়নি, তার খুব জ্বর। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, অন্তত আড়াই-তিন ডিগ্রি জ্বর হবেই। একেই বলে লাকি ব্রেক। লোকটার যদি আজ জ্বর না হত, তাহলে আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হত!

আমি আর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছি না। রবীনবাবু সবিস্তারে কাহিনিটি বলতে শুরু করেছেন, আসল কথাটা এখনও জানা যাচ্ছে না। আমি ওঁর হাত চেপে জিজ্ঞেস করলাম, সেই লোকটা কী দেখেছে?

রবীনবাবু আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, এই লোকটি সেই রাতে মাছ ধরে একটু দেরি করে ফিরছিল। ওর সঙ্গে আর এক জনও ছিল। দ্বিতীয় লোকটির দেখা আমি পাইনি, সে আজ সমুদ্রে গেছে। এরা ফেরবার সময় দেখেছে, পরিষ্কার চাঁদের আলো ছিল, তটরেখা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রে একটা নৌকো ভাসছে, তাতে বসে আছে একটি মেয়ে, সে দাঁড় নিয়ে বাইছে আর গুন গুন করে গান গাইছে। একটু দূরে গেলে আর ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় না, তাই ওরা গানটাও স্পষ্ট শুনেছে।

আমি অবিশ্বাস ও উত্তেজনার সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, ওরা চন্দ্রাকে দেখতে পেয়েছিল? তবু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেন?

রবীনবাবু বললেন, সে-চিন্তাও ওদের মাথায় আসেনি। ওদের নৌকোটা চন্দ্রার নৌকোর খুব কাছ দিয়ে এসেছে, ইন ফ্যাক্ট আমি চন্দ্রার একটা ছবি দেখাতে লোকটি মোটামুটি চিনতেও পারল। সে বলল, সব ভদ্রলোকদের মেয়েদের একই রকম দেখতে লাগে, নৌকোর মেয়েছেলেটির এই রকমই চেহারা। পাশ দিয়ে আসবার সময় চন্দ্রা ওদের কাছে

কোনও সাহায্য চায়নি, সুতরাং ওরা আর মাথা ঘামাবে কেন? এ-রকম কেউ কেউ তো নৌকো নিয়ে বেড়াতে যায়।

একথা ওরা এত দিন পুলিশকে জানায়নি কেন?

জানায়নি, তার কারণ ওদের কেউ জিজ্ঞেস করেনি। ওরা আগ বাড়িয়ে বলতে আসবে কেন? ওদের এই দেখার যে কোনও গুরুত্ব আছে, তা-ও ওরা জানে না। তাছাড়া এই সব গরিব লোক এমনিতেই পুলিশকে ভয় পায়, নিজের থেকে পুলিশের কাছে এসে এরা কক্ষনও কিছু বলে না।

চন্দ্রাকে ওরা জীবিত দেখেছে। চন্দ্রার হাতে দাঁড় ছিল, অর্থাৎ চন্দ্রা ইচ্ছে করে নৌকো নিয়ে গেছে। এগজাক্টলি! এই বৃদ্ধ জেলেটিই তার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে।

চন্দ্রা সাঁতার জানত না, সে ওভাবে ঝুঁকি নিয়ে গেল কেন?

সে খুব রোম্যান্টিক মেয়ে, সাহসও ছিল যথেষ্ট। তাছাড়া খুব রাগ কিংবা অভিমান হলে তার কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। জেদের বশে সে এমন অনেক কিছু করে ফেলতে পারত! গোপালপুরের সমুদ্র এমনিতে ঠাণ্ডা, পুরীর মতো এখানে বড় বড় ঢেউ ওঠেনা, ব্রেকার নেই, তাই দেখলে ভয় লাগে না। অনেক দূর পর্যন্ত এমনিতেই যাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ স্রোতের টান আসে। এই সমুদ্রে বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে এর আগেও দু-চার জন ডুবে গেছে। কোনও কারণে হয়তো চন্দ্রার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল, তাই সে একা একা- ।

আমি চুপ করে মাথা নিচু করে রইলাম। সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে। রবীনবাবু আমার চেয়ে বেশি চিনতেন চন্দ্রাকে, তিনি ওর চরিত্র ভাল বুঝবেন।

আরও একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে গেল। রবীনবাবু জেলেদের বস্তিতে গিয়ে অত পরিশ্রম করলেন কেন? নিতান্ত কৌতূহল? পল্লব ধরা পড়ার পরই তিনি বেশি উদ্যমী হয়ে

উঠলেন। তার নিজেরও কিছু স্বার্থ ছিল এতে। সুনেত্রা কি রবীনবাবুকেও শাসিয়ে গেছে সামনাসামনি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে এর মধ্যে সুনেত্রার দেখা হয়েছিল?

রবীনবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, সুনেত্রা? না তো! হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। এই প্রশ্নটা আমার করা উচিত হয়নি। সামলে নেবার জন্য একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমি বললাম, সুনেত্রারও দৃঢ় ধারণা ছিল, চন্দ্রা ইচ্ছে করেই নৌকো নিয়ে ভেসে গেছে। এর আগেও চন্দ্রা এ-রকম হঠকারী কাজ দু-একবার করতে গিয়ে কোনও ক্রমে বেঁচে গেছে। আজ বিকেলেই সুনেত্রা এই কথা বলে গেছে আমাকে।

রবীনবাবু বললেন, না, সুনেত্রার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এটা আমারই নিজস্ব হানচ কিংবা ইনটিউশন বলতে পারেন। আজ দুপুরেই হঠাৎ আমার ধারণা হল, জেলেদের বস্তিতে গেলে একটা কিছু পাবই।

লোকটি কোনও কারণে মিথ্যে বলছে না?

শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন? এরা এমনিতেই মিথ্যে খুব কম বলে, কিছু একটা বানিয়ে গল্প বলার ক্ষমতাই নেই। মাছ ধরা আর দুবেলা পেট ভরে খাওয়া ছাড়া আর কোনও চিন্তাই এদের মাথায় আসে না। এই বুড়োটির নাম ধরণীধর, খুবই নিরীহ ধরনের মানুষ। থানায় গিয়ে অর্জুন মহাপাত্রদের সামনে সে একই কথা বলেছে। এর সঙ্গে যে লোকটি ছিল, সে ফিরে আসবার পর আলাদা ভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেও ঠিক এক ঘটনা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই।

দূরে দেখা গেল অর্জুন মহাপাত্র, সন্তোষ মজুমদার ও অন্য ব্যক্তিটি কী সব পরামর্শ করে ফিরে এলেন। সন্তোষ মজুমদারের মুখে বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব।

অর্জুন মহাপাত্র একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়ালেন খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে। তারপর হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, সাইলেন্স! সাইলেন্স!

সব গুঞ্জন থেমে গেল, সকলে ফিরে তাকাল সেই সুঠাম, সুপ্রতিভ পুলিশ অফিসারটির দিকে।

অর্জুন মহাপাত্র বললেন, প্লিজ গিভ মি পেশেন্ট হিয়ারিং ফর আ ফিউ মিনিটস। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, ইউ হ্যাভ অ্যান ইমপর্টান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট টু মেক...।

.

১১.

অনেক দিন আগে আমি একটা ফাঁকা বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম। তখন আমার ছাত্রজীবন চলছে। সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করি। রাজনীতি থেকে প্রেম-ভালবাসা, সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি খুঁজি। যাবতীয় সংস্কারকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিই।

বাড়ির সবাই দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলেন, আমি একা ছিলাম বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। সামনেই আমার পরীক্ষা ছিল।

আমার নিজস্ব ঘরটি ছিল এক তলায়, রাস্তার পাশে। চোর-ডাকাত সম্পর্কে আমার মনে একটু একটু ভয়ের ভাব ছিল, ভূত-টুতের ভয় কখনও পাইনি। বিছানার পাশে একটা ভোজালি রাখতাম তখন।

এক দিন অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তখন কত রাত তা জানি না, ঘর অন্ধকার, আমার ডান পাশের জানলার

একটা পাল্লা খোলা, একটা পাল্লা ভ্যাজানো। সেখান থেকে শব্দ হচ্ছে, ঠক ঠক ঠক। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে ঠিক তিনবার ওই রকম শব্দ।

ঝিম ঝিম করছে রাত, রাস্তায় আর কোনও শব্দ নেই, তখন যে-কোনও শব্দই বেশ জোর মনে হয়। তবে হাওয়ার শব্দ নয়, কেউ ওই শব্দটা করছে বিশেষ কারণে।

প্রথমেই মনে হল, চোর!

কিন্তু চোর এমন শব্দ করে আমাকে জাগাবার চেষ্টা করবে কেন? কিংবা সে দেখতে চাইছে, আমি জেগে আছি কিনা!

ছিঁচকে চোর হলে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়াই উচিত। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি তীব্র গলায় বললাম, কে? কে ওখানে?

শব্দটা কিন্তু থামল না। কেউ সাড়া দিল না। আবার স্পষ্ট শোনা গেল, ঠক ঠক ঠক ঠক ঠকঠক!

জানলার খোলা পাল্লাটা দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমার সারা গায়ে শিহরণ হল। কীসের এই ডাক?

আমি নিজের চক্ষু রগড়ে ভাল করে ঘুমকে তাড়ালাম ও ভয় ভাঙালাম। আমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। ভূত-প্রেত নিয়ে চমৎকার গল্প হয়, কিন্তু বাস্তবে ওসব কিছু নেই। মৃত্যুর পর মানুষ আবার শরীর ধারণ করে আঙুল ঠোকার মতো ঠক ঠক শব্দ করতে পারে না। অসম্ভব!

উঠে গিয়ে তক্ষুনি জানলার ধারে গিয়ে দেখার বদলে আমি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, শব্দটা কীসের হতে পারে? আমার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই হেরে যেতে রাজি নয়।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল, টিকটিকি।

এবার উঠে গিয়ে বন্ধ পাল্লাটা খুলে ফেললাম এক টানে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। একটা বেশ গাবদা গোছের টিকটিকি একটা বড়সড় মথকামড়ে ধরেছে। মথটা তখনও মরেনি, ডানা ঝাপটাচ্ছে। টিকটিকিটা মাথা ঠুকে ঠুকে মথটাকে মারবার চেষ্টা করছে। তাতেই অবিকল আঙুল ঠোকার শব্দ।

সে রাতে আমি অদ্ভুত একটা আনন্দ পেয়েছিলাম। কত লোক রাত্তিরবেলা কলাগাছ কিংবা বেলগাছ দেখে ভয় পায়। কত লোক নিশুতি রাতে অলৌকিক পায়ের শব্দ শোনে। আসলে এ-সবই সামান্য ব্যাপার। একটু চিন্তা করলেই সহজ সমাধান পাওয়া যায়।

কিন্তু এক-এক সময় যুক্তিবোধ আমাকে ছেড়ে যায়। যুক্তি প্রয়োগ করার আগেই চোখ এবং কানকে চমকপ্রদ ভাবে বিশ্বাস করে বসি। হয়ত কোনও কোনও জায়গায়, যুক্তির বদলে বিশ্বাস করে নেবার জন্য মনটা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে।

ঠিক সেই রকমই একটা ঘটনা আচমকা ঘটে গেল এই পাম বিচ হোটেলে, এত লোকজনের মাঝখানে। আমার বুক কাঁপিয়ে দিল শুধু না, আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

অর্জুন মহাপাত্রের ঘোষণার পর উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রার মৃত্যু এখন পুরনো হয়ে গেছে। তার জন্য শোক করার অবকাশ এখানে কারুর নেই। চন্দ্রার বাবা ও বোনের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু তারা এখানে আসেননি। অন্য সবাই একটা চাপা আশঙ্কা ও অস্বস্তিতে ভুগছিল। পল্লবকে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ, সেই সূত্র ধরে আরও কাকে কাকে হয়রানি করবে তার ঠিক নেই। সকলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে শুটিঙের ক্ষতি করা হচ্ছিল। এই সব কিছুর জন্যই দায়ী চন্দ্রা। চন্দ্রার বাবাও পুলিশের কাছে নানা অভিযোগ করেছিলেন ফিল্ম ইউনিটের নামে। মামলা করার ভয় দেখিয়েছেন।

এখন সব কিছু চুকে বুকে গেছে। চন্দ্রা নিজেই বোকার মতো একা একা সমুদ্রে নৌকো বাইতে গিয়েছিল। তার ফলে সে ডুবে মরেছে। এতে অন্য কারুর দায়িত্ব নেই। সবাই এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এই কদিন একটা থমথমে আরহাওয়া ছিল, এখন এখানে বইছে মুক্তির হাওয়া। বেশ কোলাহলের মধ্যে পানাহার চলছে।

এরই মধ্যে আরও একটা খবর পাওয়া গেল যে, ডুবুরিরা উদ্ধার করেছে নৌকোটা। সেটা একটা ডুবো পাথরের খাঁজে আটকে ছিল। চন্দ্রার বডি অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে ডুবুরিরা আশা রাখে, তারা কালকের মধ্যে পেয়ে যাবে ঠিক।

আমি অবশ্য মনে মনে চাইছিলাম, চন্দ্রার শরীরটা যেন পাওয়া না যায়। তার পচা-গলা-বীভৎস দেহটা দেখে আর কী লাভ হবে? বরং তা হাঙর ও মাছেদের খাদ্য হোক।

সারা দুপুর-বিকেল রবীনবাবু অনেক পরিশ্রম করেছেন বলে বেশ খানিকটা বিয়ার পান করে ফেললেন। তাঁর মুখটা লালচে হয়ে গেছে। তিনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, কিছু দিন আগেও এক জেলার এস পি ছিলেন, এখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি আই জি, অপরাধ ও খুন-জখম সম্পর্কে তার যথেষ্টই অভিজ্ঞতা থাকার কথা। তবু তিনি চন্দ্রার মতো একজন অল্পখ্যাত অভিনেত্রীর ব্যাপার নিয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন মনে হচ্ছে।

সুগত এসে আবার যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। সে নানা রকম বকবক করে যাচ্ছে, সবসময়ই একটা না-একটা কিছু পিলে চমকানো খবর তার বানানো চাই-ই। যেমন এইমাত্র সে জানাল যে, সন্তোষ মজুমদারের এই ফিল্মটির গল্প আলফ্রেড হিচককের একটা সিনেমা থেকে হুবহু টোকা। চন্দ্রা যে-ভূমিকাটা করছিল, সেটা অরিজিন্যাল ছবিতে ছিল অড্রি হেপবার্নের।

রবীনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হলিউডের সব ছবিই তার নখদর্পণে। অড্রি হেপবার্ন যে হিচককের কোনও ছবিতেই অভিনয় করেনি, সেটা রবীনবাবুর চোখ দেখেই বোঝা গেল।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি বাড়ি যাই। প্রতিমাকে কিছু বলে আসিনি। লেটেস্ট ডেভেলাপমেন্ট শুনলে সে চমকে যাবে, খুশিই হবে।

খুশি শব্দটা আমার কানে লাগল। এখানে এই শব্দটা কি মানায়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, খুশি হবেন কেন!

রবীনবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে বললেন, না, মানে চন্দ্রার এ-রকম পরিণতি খুবই স্যাড। তবে মিস্ট্রিটা সলভড হয়ে গেল, এটা সকলের পক্ষেই একটা গ্রেট রিলিফ, তাই না?

সুগত বলল, সব কিছুই সলভড হয়ে গেছে, কী করে বললেন? চন্দ্রা যদি সুইসাইড করেও থাকে, তাহলেও সুইসাইডে ইনভেস্টিগেট করাও একটা ক্রাইম। কেউ যদি চন্দ্রার মনে খুব জোর আঘাত দিয়ে থাকে, তার ফলে যদি চন্দ্রা আত্মহত্যা করতে চায়, তাহলে যে আঘাত দিয়েছে, সে দায়ী হবে না? তরুণী বধূরা নিজেরাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগালে শাশুড়ি আর দেওরকে ধরা হয় কেন?

রবীনবাবু বললেন, এখন আর এসব কথা শুনতে ভাল লাগছে না। আমি এবার যাই।

আমিও রবীনবাবুর সঙ্গে উঠে পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুগত আমার হাত চেপে ধরল জোর করে। ঈষৎ নেশাগ্রস্ত গলায় বলল, আপনার জন্য তো এখানে বাড়িতে আপনার বউ অপেক্ষা করে বসে নেই, আপনার এত তাড়া কীসের?

মাতালদের সঙ্গে জোরাজুরি করা মুশকিল, আমাকে আর একটু বসতেই হল।

এরপর সুগত একে একে পাঁচ জনের নামে ছড়াতে লাগল সন্দেহের বীজ। তারা প্রত্যেকেই চন্দ্রার মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত হতে পারে, তারা প্রত্যেকেই কোনও না-কোনও সময়ে চন্দ্রার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এই ছবির অন্যতম প্রোডিউসার নাকি সরাসরি

বলে দিয়েছিল, চন্দ্রা একবার অন্তত তার শয্যাসঙ্গিনী না হলে চন্দ্রার বড় রোল পাবার কোনও আশা নেই। সন্তোষ মজুমদারও চন্দ্রাকে বলেছিল, তুই একবার মাত্র প্রোডিউসারের ভাগ্নের সঙ্গে শুবি, তাতে এত আপত্তি কীসের? এতে কি তোর শরীরে কোনও দাগ পড়বে?

সিনেমার কাগজে অভিনেত্রীদের নিয়ে এ-রকম গালগল্প প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকে। আমি মন দিয়ে সুগতর কথা শুনছিলামই না। তাকিয়ে ছিলাম সমুদ্রের দিকে।

সুগত নিজের বুক চাপড়ে বলল, চন্দ্রাকে সব সময় কে বাঁচাত জানেন? এই আমি! এই শালা সুগত মজুমদার। চন্দ্রা আমাকে খুব বিশ্বাস করত। যে-কোনও বিপদ-আপদে ছুটে আসত আমার কাছে, তা জানেন? এবারই আমার পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল...।

মাতালদের নিয়ে এই এক মুশকিল, যত নেশা বাড়ে, ততই তারা আমি আমি শুরু করে। পৃথিবীর সব কিছুই যেন সেই আমিকে কেন্দ্র করে ঘোরে!

আমি বাথরুমে যাবার নাম করে উঠে পড়ার চিন্তা করছি, এমন সময় সেই কাণ্ডটি ঘটল।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা খালি চেয়ার পড়ে ছিল। অনেকক্ষণ থেকেই সেটা খালি দেখছি। হঠাৎ চোখের একটি পলক ফেলতেই দেখলাম, সেখানে একটি নারীমূর্তি বসে আছে। এক মুহূর্ত আগেও চেয়ারটা খালি ছিল, কী করে সেখানে এক জন এসে বসে পড়ল?

চন্দ্রা! এবার আমি তার মুখও দেখতে পাচ্ছি। সেই চেহারা, সেই চোখ। না, কোনও ভুল নেই।

আমার শরীর অসাড় হয়ে গেল, আমার গলার কাছে যেন দম আটকে এল। চন্দ্রা যদি রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ফিরে আসে, তাহলে আমার আনন্দে চিৎকার করে ওঠার কথা। কিন্তু আমার কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না!

আমার যুক্তিবোধ নিঃস্ব হয়ে গেছে। আমি নিজের চোখে চন্দ্রাকে দেখছি, ভয় পাচ্ছি, অথচ পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।

সুগত অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, সে লক্ষ্য করছে না কিছুই। আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছি চন্দ্রার দিকে। তার সমস্ত চুল খোলা, আগে সব সময় এ-রকম খোলা চুলেই তাকে দেখেছি, তার গাড় নীল রঙের শাড়িটাও যেন আমার চেনা।

এক সময় আমি অতি কষ্টে সুগতকে একটা ঠ্যালা মেরে ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, সুগত, ও কে?

সুগত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, কার কথা বলছেন?

এবার আমার সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি লাগল। শুধু আমিই একা দেখব, আর কেউ দেখতে পাবে না?

আমি বলালম, ওই যে, চেয়ারে বসে আছে, দেখো, দেখো।

সুগত এবার বারান্দার প্রান্ত দেখে হেসে উঠে বলল, ওকে চেনেন না? ও তো বিশাখা। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?

আমি নিজে স্পষ্ট দেখছি চন্দ্রাকে, আর সুগত বলছে ওর নাম বিশাখা! এ আবার কী-রকম ধাঁধা? , আমার চোখে কি এত ভুল হতে পারে?

সুগত চেঁচিয়ে ডাকল, এই বিশাখা, বিশাখা, একবার এ-দিকে এসো তো।

মেয়েটি ডাক শুনে মুখ ফেরাল, উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তখনও আমি চন্দ্রাকেই দেখছি। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে! আশেপাশের সব কিছুই যেন অলীক। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মেয়েটি কাছে আসবার পর সুগত একটা চেয়ার টেনে বলল, বোসো। বিশাখা তুমি সুনীলদাকে চেনোনা?

মেয়েটি পাতলা করে হেসে বলল, হ্যাঁ, খুব ভালই চিনি।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় চন্দ্রা ঠিক এই কথাই বলেছিল।

সুগত আবার বলল, সুনীলদা, বিশাখাকে কলকাতা থেকে আনানো হয়েছে। ও চন্দ্রার ভূমিকায় বাকি অংশটার শুটিং চালিয়ে দেবে। বিশাখা খুব ভাল অ্যাকট্রেস! তবে বড্ড মুডি। এক-এক সময় আমাদের চিনতেই পারে না। এই বিশাখা, তুমি এরই মধ্যে মেক আপ নিয়ে বসে আছ, এক্ষুনি শুটিং শুরু হবে নাকি?

মেয়েটি বলল, একটু বাদেই। আমাকে দিয়েই প্রথম শট নেবে।

তক্ষুনি সব কিছু জলের মতো সরল হয়ে গেল। চন্দ্রার বদলে তার অসমাপ্ত ভূমিকাটুকু চালিয়ে দেবার জন্য বেছে বেছে অন্য একটি অভিনেত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। মোটামুটি চন্দ্রার সঙ্গে চেহারার মিল আছে, শরীরের গড়ন, মুখের ভাব অনেকটা এক রকম। সিনেমায় এরকম ডাবলের ব্যবহার তো প্রায়ই হয়। ভাল করে মেক আপ দিলে ধরতে পারা শক্ত।

এ-ও সেই টিকটিকির ব্যাপার। কিন্তু আমি আগেই বুঝতে পারিনি কেন? আমার মন প্রস্তুত ছিল না। এমনি এক মুহূর্তের মধ্যে চেয়ারে এসে ওর বসাটাও আমার মনে হয়েছিল অস্বাভাবিক, অলৌকিক! খালি চেয়ারে হঠাৎ একটি মেয়ে এসে বসতে পারে না?

জ্বর ছেড়ে যাবার মতো আমার শরীরে ঘাম ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু। এই মেয়েটিকেই আমি বৃষ্টির মধ্যে লাল ছাতা মাথায় হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। একেই দেখেছিলাম, সন্ধের আবছা আলোয় একটা নৌকোর ওপর বসে থাকতে।

চন্দ্রা একটা নৌকো নিয়ে হারিয়ে গেছে, তা কিমবিশাখা জানে না? তবু সে সন্ধেবেলা একা একটা নৌকোয় বসে ছিল কেন? বেশি বেশি সাহস দেখাতে?

মুখখানা পেইন্ট করা, ভুরু দু'টি গভীর ভাবে আঁকা, গালে লালচে আভা, বিশাখা আমার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। আমি অস্বস্তি কাটাতে পারছি না। নিজের কাছেই নিজের পরাজয়ে খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

বিশাখা জিজ্ঞেস করল, এই গল্পটা বুঝি আপনার লেখা? জানতাম না তো!

আমি আস্তে আস্তে বললাম, না, আমার লেখা নয়।

সুগত বলল, অরিজিন্যাল গল্পটা কার লেখা, ভগবান জানেন! বাংলা স্টোরিটা হিচককের ফিল্ম দেখে মেরে তিন জনে বানিয়েছে। নাম থাকবে সন্তোষ মজুমদারের। আজকাল পরিচালকরা একই সঙ্গে কাহিনি, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, রূপসজ্জা, পাবলিসিটি, সব কিছুর ক্রেডিট নেয়। সব্বাই সত্যজিৎ রায়ের এঁটো কলাপাতা! হে-হে-হে-হে!

বিশাখা বলল, ডায়ালগগুলো কে লিখেছে? আমারটা একটু বদলানো দরকার। আমি ঠিক মুড আনতে পারছি না। আচ্ছা সুনীলদা, আমার একটা ডায়ালগ শুনবেন? 'দুঃখী মানুষদের সব সময় দুর্বল ভেবো না। দুঃখীদের অভিমান তোমার মতো অত্যাচারীদের এক সময় পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে!' এখানে অভিমান কথাটা কি ঠিক খাটে? ক্রোধ হওয়া উচিত না? আর যদি অভিমান রাখতেই হয়, তাহলে পুড়িয়ে ছারখারের বদলে বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে বললে ভাল শোনায় না?

একটু আগেই আমার একটা বিরাট ভুল ভেঙেছে, আমি এখন স্বাভাবিক হতে পারিনি, এই সব ব্যাপারে মতামত দেবার ইচ্ছেও হল না আমার। শুকনো গলায় বললাম, আগেরটাও চলে যেতে পারে।

বিশাখা তবু ছেলেমানুষি সুরে বলল, না, আপনি ঠিক করে বলুন, অভিমান, না ক্রোধ, কোনটা এখানে ঠিক হবে?

তুমি আমাকে চিনলে কী করে, বিশাখা?

বাঃ, আপনাকে দেখেছি তো কতবার! কবি সম্মেলনে আপনার কবিতা পাঠ শুনেছি। আমিও অনেক জায়গায় কবিতা আবৃত্তি করি। এক দিন শিশির মঞ্চের একটা অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আমারও ছিল। কিন্তু আপনি গোড়ার দিকে নিজেরটা পাঠ করেই চলে গেলেন, আমাদেরগুলো শুনলেন না। সেদিন আমার খুব রাগ হয়েছিল।

সুগত বলল, অভিমান না রাগ?

বিশাখা বলল, সুনীলদার সঙ্গে কি আমার পরিচয় ছিল যে অভিমান হবে? যখন তখন মানুষের রাগই হয়। অভিমান অনেক গভীর।

সুগত বলল, মেয়েদের কোনটা রাগ আর কোনটা অভিমান বোঝা মুশকিল। আমার ওপর যেন কক্ষন অভিমান কোরো না। তোমার নাম সন্তোষবাবুর কাছে কে সাজেস্ট করেছে জানো? এই আমি! চন্দ্রার বদলে ওরা কাকে নেবে, কাকে নেবে ভাবছিল, আমি সন্তোষবাবুকে বললাম, বিশাখাকে নিন। খুব ট্যালেন্টেড অ্যাকট্রেস, গলাখানা ভাল, মেকআপ দিলে চেহারাটাও উতরে যাবে।

বিশাখা বলল, এই, উতরে যাবে মানে?

সুগত বলল, আই মিন, চন্দ্রার সঙ্গে অনেকটা মিলে যাবে। আমার কথা শুনেই তো ওরা ডিসিশান নিল। এরা আমার মতামতের মূল্য দেয়, বুঝলে?

সুগত আবার আমি, আমি শুরু করেছে। এবার উঠতেই হয়।

বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললাম, এক দিন তোমার আবৃত্তি নিশ্চয়ই শুনব। আজ চলি।

বিশাখা দারুণ অবাক হবার ভঙ্গি করে বলল, চলে যাচ্ছেন? শুটিং দেখবেন না?

হেসে বললাম, না, শুটিং দেখা আর হবে না। আমার একটা অন্য কাজ আছে।

বিশাখা অনুনয়ের সুরে বলল, একটুক্ষণ থাকুন, প্লিজ একটু দেখে যান।

সুগত ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, জোর করে ধরে রাখো। কিস্যু কাজ নেই, সুনীলদা কেটে পড়ার তালে আছে। এখন গিয়ে রবীনবাবুর সঙ্গে আড্ডা মারবে।

বিশাখা সচকিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, রবীনবাবু মানে যিনি একটু আগে এখানে বসেছিলেন? পুলিশের ডি আই জি?

তুমি তাকেও চেনো নাকি?

খানিকটা রহস্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট মুচড়ে হেসে বিশাখা বলল, হ্যাঁ, ভালই চিনি। উনি অবশ্য এখানে আমাকে একবার দেখেও না চেনার ভান করলেন।

রবীনবাবু পুলিশ অফিসার হলেও ফিল্ম সম্পর্কে খুব উৎসাহী। বাংলা ফিল্মের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি চন্দ্রা আর বিশাখাকে আগে থেকেই চেনেন।

আমার দিকে ঘুরে বিশাখা বলল, আপনি কিন্তু আজ পালাতে পারবেন না, একটুখানি থাকতেই হবে।

কিছুতেই এড়ানো গেল না, আমাকে বসে যেতেই হল।

অর্জুন মহাপাত্র সদলবলে চলে গেলেন একটু আগেই। অন্যান্য অতিথিরাও বিদায় নিচ্ছেন। সন্তোষ মজুমদার আমাদের সঙ্গে এসে বসলেন একটু। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আজ থেকে আবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব। ওয়েদারটাও কী-রকম ফাইন হয়ে গেছে দেখুন। আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে না।

একটু বাদে এক জন এসে খবর দিল, লাইটিং রেডি। এখুনি শুটিং শুরু হবে।

রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। এখনও শুটিং দেখার জন্য বেশ কিছু মানুষ ভিড় করেছে। তাদের সরিয়ে রাখা হয়েছে একটা দড়ির রেখার বাইরে। আমাকে একটা চেয়ার পেতে দেওয়া হল তার উলটো দিকে।

বিশাখাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে একটা গাছের সঙ্গে। শুধুশায়া আর ব্লাউজ পরা। শাড়িটা খসে পড়ে আছে পায়ের কাছে। শুধু শায়া-ব্লাউজ পরা অনেক মেয়েকেই দেখা যায় ফিল্মে, কিন্তু শাড়িটা খুলে পায়ের কাছে রেখে দেওয়ায় একটা অতিরিক্ত সাজেশান এসেছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ভিলেন, হাতে তার একটা চাবুক। তাকে বড্ড বেশি ভিলেন দেখতে। মনে হয় গত শতাব্দীর কোনও ডাকাতের সর্দার। বিশাখা হচ্ছে নায়িকার বোন, ভিলেন তাকে ধরে এনে নায়ককে ব্ল্যাকমেইল করবে। এই দৃশ্যেই কোনও এক সময় বীরের মতো উপস্থিত হবে নায়ক। তারপর ফাইটিং সিন।

যদি আলফ্রেড হিচককের কোনও ছবি থেকে গল্পটা মারা হয়ে থাকে, তবু যারা বাংলায় তার রূপান্তর ঘটিয়েছে, তাদের উর্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা করতেই হয়। এ-রকম একটা রগরগে দৃশ্য কল্পনা করা হিচককের অসাধ্য ছিল!

চন্দ্রার এটাই ছিল টপসিন, সে আর সুযোগ পেল না।

চন্দ্রার মতোই বিশাখাও পড়াশুনো করা মেয়ে মনে হল। সাহিত্যরুচি আছে। সংলাপের ভুল শব্দ ব্যবহার নিয়ে সে খুঁত খুঁত করে। অথচ এই সব মেয়েরই কী সব বিশ্রী, কুরুচিপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়।

সভোষ মজুমদার মাথায় একটা সাদা রঙের টুপি পরেছেন। এটা বিদেশি পরিচালকদের অনুকরণ। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন চারদিকে। দু-তিনবার ক্যামেরায় লুক থ্রু

করলেন। এক জনকে ডেকে বলে দিলেন বিশাখার মেক আপটা সামান্য বদলে দিতে। খোলা চুল পিঠ থেকে সরিয়ে আনা হল বুকের ওপর।

এদের কৃতিত্ব আছে, বিশাখাকে এখন অবিকল চন্দ্রার মতো দেখাচ্ছে।

এক সময় সন্তোষ মজুমদার একটা সাদা রঙের চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে ডান হাত উঁচু করে চিৎকার করে বললেন, টেকিং! সাইলেন্স! সাইলেন্স! স্টার্ট সাউন্ড!

উত্তর এল, রানিং।

সন্তোষ মজুমদার আবার সজোরে বললেন, ক্যামেরা!

এক জন ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে বলে গেল, সিন ফর্টি নাইন, টেক ওয়ান!

ক্যামেরা প্যান করে এসে ফোকাস করল বিশাখার মুখের ওপর। বিশাখা ক্লান্ত চোখ মেলে আস্তে আস্তে তাকাল সামনে। তারপর মুহূর্তের পর মুহূর্ত চুপ। সন্তোষ মজুমদার ঠোঁট নাড়ছেন, অর্থাৎ তিনি ডায়ালগ শুরু করতে বলছেন।

বিশাখা কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল, আমি তোমাদের চিনেছি। আমি তোমাদের সবাইকে চিনেছি। আমার দরজা বন্ধ ছিল-।

সন্তোষ মজুমদার প্রায় আর্তনাদের মতো বলে উঠলেন, কাট! কাট!

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ক্যামেরা। সন্তোষ মজুমদার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে বললেন, কী হল? এটা কোন সিনের ডায়ালগ? এখানে তো এই ডায়ালগ ছিল না।

এক জন সহকারী পরিচালক চিত্রনাট্যের ফাইল নিয়ে ছুটে এল। ফরফর করে পাতা উলটে সে বলল, এ ডায়ালগ অনেক আগের সিনের, চন্দ্রাই করে গেছে। বিশাখাকে আমি এইসিনের ডায়ালগ দিয়েছি, কতক্ষণ ধরে মুখস্থ করলাম।

বিশাখা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সন্তোষ মজুমদার তাকে এক ধমক দিতেই সে বলল, ভুল বলেছি?

সহকারী পরিচালকটি বলল, ভুল মানে? একেবারে উলটো-পালটা ডাবিঙের সময় লিপ মিলবে না।

বিশাখা এবার লজ্জায় জিভ কেটে বলল, ও মা, কী করে ভুল হল? আমার কক্ষনও মুখস্থ ভুল হয় না।

চিত্রনাট্য দেখে আবার সংলাপ ঝালিয়ে নিল বিশাখা।

সবাই ফিরে গেল যে যার জায়গায়। ভিলেন একবার শপাং করল চাবুকটা। সন্তোষ মজুমদার আবার চেয়ারে উঠে হাত তুলে বললেন, সবাই রেডি? টেকনাম্বার টু। স্টার্ট সাউন্ড!

ক্যামেরা ঘুরে এসে বিশাখার মুখের সামনে স্থির হয়েছে, বিশাখা ভিলেনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তারপর বলল, আমি..আমি..আমি...আমি...আমি...

রীতিমতো তোতলাচ্ছে বিশাখা, আমি শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছে না। সন্তোষ মজুমদারের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শুধু শুধু ফিল্মের ফুটেজ খেয়ে যাচ্ছে। তিনি এক সময় গর্জন করে উঠলেন, কাট! কাট!

এবার তিনি চেয়ার ছেড়ে বিশাখার থুতনিতে একটা খোঁচা মেরে বললেন, এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? ভ্যালুয়েবল টাইম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বিশাখা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সহকারী পরিচালক আবার ছুটে এসে বলল, আমি কোথায় পেলে? আরম্ভটাই ভুল করলে। আরম্ভটা হবে, দুঃখী মানুষদের দুর্বল মনে কোরো না...।

বিশাখা বলল, কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুতেই মনে আসছে না।

সন্তোষ মজুমদার রাগে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন।

আমি ভেবেছিলাম, বিশাখা হয়তো সংলাপ একটু আধটু বদলে দেবে, অভিমানের জায়গায় ক্রোধ চালিয়ে দেবে। কিন্তু সে কোনও কথাই বলতে পারছে না, এটি সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। খুব নবিস অভিনেত্রীরাও এ-রকম করেনা। বিশাখাকে তো বেশ সপ্রতিভই মনে হয়েছিল।

বিশাখা সলজ্জ ভাবে একবার আমার দিকে তাকাল।

সন্তোষ মজুমদার আর একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে এসে বললেন, নিন, একটা সিগারেট খান। আপনি এই প্রথম শুটিং দেখতে এলেন, অথচ কীরকম ধ্যাড়াচ্ছে বলুন তো। এটা একটা ভাইটাল সিন!

পাশ থেকে এক জন হোমরা-চোমরা ধরনের লোক ফিস ফিস করে বললেন, মেয়েটার ডায়লগ অফ করে দিন না!

সন্তোষ মজুমদার বললেন, দাঁড়ান না, আর একটু দেখতে দিন না। শুধু একতরফা ভিলেন কথা বলে গেলে আর চাবুক হাঁকড়ালে জমে কখনও? মেয়েদের গলার আওয়াজেই একটা অন্য রকম আপিল থাকে।

হোমরা-চোমরা ব্যক্তিটি ঠোঁট ওলটালেন। তারপর বিড় বিড় করে বললেন, আর তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। একেই তো উটকো ঝঞ্ঝাটে অনেকটা সময় চলে গেল।

সন্তোষ মজুমদার আর কিছুনা বলে সিগারেট টানতে লাগলেন।

সহকারী পরিচালকটি পাখি পড়াবার মতো করে বিশাখাকে সংলাপ মুখস্থ করাচ্ছে। বিশাখা খুব মনসংযোগ করে, চোখ বুজে দু'বার করে উচ্চারণ করছে প্রতিটি বাক্য। দূরের দর্শকরা অধীর হয়ে উঠেছে খানিকটা। শুটিং একেবারে জমলেই না এখনও পর্যন্ত। ভিলেনের তর্জন-গর্জন দেখলে তারা মজা পেত খানিকটা। কিন্তু সে বেচারা শুধু একটু চাবুক নাড়ানো ছাড়া আর কোনও সুযোগই পায়নি।

অবশ্য অধিকাংশ শুটিংই এ-রকম। একই শট দু-তিনবার এন জি হয়, বার বার একই জিনিস দেখতে হয়। তবে, এ-রকম পার্ট ভুলে যাওয়া সত্যিই অভিনব।

এখনও আকাশে বেশ জ্যোৎস্না আছে, ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোট মেঘ আনাগোনা করছে চাঁদের ওপর দিয়ে।

সন্তোষ মজুমদার খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সিনটা ডিফিকাল্ট, তা ঠিকই। মেয়ে চরিত্রটা তো ভ্যাম্প নয়, ভদ্রঘরের মেয়ে। তার শাড়ি খুলে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু কথা বলবে কান্না কোন্না গলায়। চন্দ্রা এই জায়গাটা একেবারেই পারছিল না। সে যে-দিন ডিসঅ্যাপিয়ার করে, সে-দিন দুপুরেও এই সিনটা দু-একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। চন্দ্রার ঠিক এক্সপ্রেশান ফুটছিল না বলে প্রোডিউসাররা চেয়েছিল, সিনটায় চন্দ্রার ডায়ালগ সব বাদ দিয়ে দিতে। ওর শুধু বডিটা ইউজ করা হবে। কিন্তু এই মেয়েটা, বিশাখা, এ ভাল অভিনয় করে। এর না পারার কোনও কারণ নেই। এই বিশাখা স্মার্ট মেয়ে, সাঁতার আর অন্যান্য দু-একটা স্পোর্টসে মেডেল পেয়েছে, আবৃত্তি ভাল করে। চন্দ্রার চেয়েও অনেক সুপিরিয়ার অ্যাকট্রেস, আমি সিওর ছিলাম ও ভাল করবে।

এতক্ষণ বাদে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে চন্দ্রার বদলে আগেই বিশাখাকে নেননি কেন?

সন্তোষ মজুমদার অদ্ভুত ভাবে হাসলেন। তারপর বলনে, ফিল্ম লাইনের সব ব্যাপার আপনি বুঝবে না। কাস্টিঙের সময় অনেক কিছু কনসিডার করতে হয়। চন্দ্রা এখনও ঠিক প্রফেশনাল নয়, আই মিন, ছিল না। আর বিশাখা একটা স্টেজে নিয়মিত অভিনয় করে।

শনি-রবিবার ডেট দিতে পারে না। ঠিক এই সময় অবশ্য ওদের নাটকটা বন্ধ আছে, আমরা লাকি...।

একটু থেমে সন্তোষ মজুমদার আবার বললেন, বিশাখা যে এ-রকম ভাবে সময় নষ্ট করবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

সহকারী পরিচালকটি বলে উঠল, এবার ঠিক আছে সন্তোষদা! আরম্ভ করুন।

সন্তোষ মজুমদার আবার চলে গেলেন ক্যামেরার কাছে। লাইটিঙের সামান্য পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে চেঁচালেন, টেকিং! স্টার্ট সাউন্ড! ক্যামেরা!

আগের মতো আবার শুরু হল। ভিলেনটি একবাবের বদলে তিনবাব শপাং শপাং করল চাবুক। ক্যামেরা বিশাখার মুখের ক্লোজ আপ ধরে আছে।

চোখ খুলে তাকাল বিশাখা, ভিলেনের বদলে পবিচালকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দুটি যেন বেশি উজ্জ্বল। বেশ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল, তা-ও সে কোনও শব্দ উচ্চারণ করছে না।

সন্তোষ মজুমদার অস্থির ভাবে বলে উঠলেন, কী হল বিশাখা, ডায়ালগ দাও! ডায়ালগ! সুজিতের দিকে তাকাও।

বিশাখা তবু চেয়ে রইল পরিচালকের দিকে। তার দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই।

সন্তোষ মজুমদার আবার আদেশ দিলেন, বিশাখা, ডায়ালগ! ডায়ালগ বিশাখা তবু চুপ।

সন্তোষ মজুমদার বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দুর ছাই! এ যে কলাগাছের অধম! কাট। লাইটস অফ!

তীব্র আলোগুলো হঠাৎ নিভে যেতেই বিশাখা ভেঙে পড়ল কান্নার ঝাপটায়। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল, আমি পারছি না। আমি পারছি না। কিছুতেই আমার মনে আসছে না।

.

১২.

পরদিন বিকেলে আমার ফিরে যাওয়া হল না।

কারণটা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে কাউকে বোঝানো যাবেনা।

সকালবেলা সুগত এসে বলল, সুনীলদা, আপনি আজই কলকাতায় ব্যাক করছেন? চলুন, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। আমারও আর এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। চন্দ্রার ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেল। মি. অর্জুন মহাপাত্রও আজ যাচ্ছেন, ওঁর গাড়িতে আপনি গেলে আমিও বেরহামপুর পর্যন্ত লিফট নেব। কলকাতায় আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

অর্জুন মহাপাত্রের গাড়িতে আমি যাব না, সেটা আগেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সুগতকে এড়ানো যায় কী করে? ট্রেনের সারাটা রাস্তা সুগতের সাহচর্যে কাটানো আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হলনা। একটু বেশি কথা বললেও সুগত ছেলেটি খারাপ নয়। কিন্তু ট্রেনে আমি চুপচাপ বই পড়তে ভালবাসি, সুগত সে সুযোগ আমাকে দেবে না।

সুতরাং ওকে বললাম, আজ আর ফেরা হবে না ভাই। আমার শরীরটা ঠিক ভাল লাগছেনা। জ্বর জ্বর লাগছে, আর একটা দিন দেখে যাই।

সুগত চলে গেল। আমাকেও মিথ্যে কথার ফলভোগ করতে হল। অনেক সময় মিথ্যে অজুহাতটা হঠাৎ সত্যি হয়ে যায়। দুপুরের দিকে আমার সত্যি সত্যি জ্বর এল। সেই সঙ্গে পাতলা সর্দি।

টকটক করে দু'পেগ ব্র্যান্ডি মেরে দিয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়। এটাই সর্দি জ্বরের আমার নিজস্ব ওষুধ। এর পরে দুপুরটা টানা ঘুম দিতে পারলে জ্বর-টর ছেড়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু ঘুম এলনা। এ-বই সে বইয়ের পাতা ওলটাই, কোনওটাতেই মন বসেনা। বিকেলের দিকে রবীনবাবু দেখা করতে এলে আমি খুশিই হলাম বেশ। কারুর সঙ্গে একটু কথা বলতেই মন চাইছিল। রবীনবাবু এসেই বললেন, এদের শুটিং তো একেবারে গড়বড় হবার জোগাড়। শুনেছেন কিছু?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো! আবার কী গণ্ডগোল হল?

রবীনবাবু বললেন, প্রথম কথা, বিশাখা এমন সব উলটো-পালটা কাণ্ড করছে, যা একেবারে অবিশ্বাস্য। সে কান্নার জায়গায় হাসছে, হাসির জায়গায় কাঁদছে। মাঝে মাঝে এমন সব ডায়ালগ দিচ্ছে, যা শুনলে পিলে চমকে যায়। এই ছবিতে তা একেবারেই বেমানান। সবই যেন অভিমানের কথা।

আমি বললাম, বিশাখা বোধহয় এই ফিল্মের রোলটা সিরিয়াসলি নেয়নি। একেই তো এলেবেলে পার্ট, তা-ও অন্যের ডাবল। ওর কেন উৎসাহ থাকবে বলুন!

রবীনবাবু বললেন, তা নয়, তা নয়। যত ছোটই পার্ট হোক, তবু সিরিয়াসলি নিতে হয়। বিশাখা যেন নিজেই বুঝতে পারছে না, কেন তার এত ভুল হচ্ছে! আরও কী কী হচ্ছে শুনুন। সুনেত্রা হঠাৎ আছাড় খেয়ে পা মচকেছে। সন্তোষবাবুর গলা বসে গেছে ঠাণ্ডায়, এমনই বসে গেছে যে চিঁ চিঁ করে কী যে বলছেন, বোঝাই যাচ্ছে না। এরা এন এফ ডি সি থেকে নতুন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, খুব চমৎকার কাজ হচ্ছিল, কিন্তু তার লেন্সে ফাঙ্গাস দেখা দিয়েছে, ছবি ক্লিয়ার আসছে না। হঠাৎ যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে এই ইউনিটটার ওপর। সন্তোষবাবু নাকি প্যাক আপ করে কালই ফিরে যাবেন ভাবছেন। এ যাত্রায় আর শুটিং কমপ্লিট হবে না।

এ সংবাদ শুনে আমার কোনও দুঃখ হল না। এই ফিল্মের শুটিং নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।

রবীনবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর ধারণা, এই ফিল্মের দলটির ওপর চন্দ্রার অভিশাপ লেগেছে।

আমি সামান্য হেসে বললাম, অভিশাপ আবার কী? প্রতিমা এই সব বিশ্বাস করেন বুঝি? ওঁর কথাবার্তা শুনে আগে তো মনে হয়নি।

প্রতিমার কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। প্রতিমার মতে, কোনও মানুষের অকালমৃত্যুর একটা সাইকিক এফেক্ট আশেপাশের কিছু মানুষের ওপর পড়েই। সেটাকেই অনেকে বলে, এক জনের আত্মা আর একজনের ওপর ভর করে। আত্মায় বিশ্বাস না করলেও এ-রকম কিছু কিছু ব্যাপার সত্যিই ঘটে। চন্দ্রা এই ফিল্ম-টা কমপ্লিট করতে পারল না, তার জায়গায় এসেছে বিশাখা। কিন্তু চন্দ্রার অতৃপ্তিই তাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। নইলে বিশাখার মতো মেয়ে এ-রকম ভুল করবে কেন? এ সম্পর্কে আপনার কী মত?

বুল শিট! মৃত মানুষের অতৃপ্তি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না। পৃথিবীতে কত মানুষ মরছে, তাদের জায়গায় অন্য মানুষ রিপ্লেসড হচ্ছে, প্রফেশনাল জগতে এ-রকম অনবরত চলছে। মনে করুন, একটা পত্রিকায় আমার ধারাবাহিক উপন্যাস চলছে, সেটা শেষ হবার আগেই যদি আমি মারা যাই, পত্রিকার সম্পাদক চুপ করে বসে থাকবেন? পরের সংখ্যা থেকেই নতুন একজনের উপন্যাস শুরু হবে। পরে যে লিখবে, তার কি কোনও গিলটি ফিলিং হবে? নাকি, আমার অতৃপ্ত আত্মা তাকে ভয় দেখাবে?

তাহলে বিশাখা এ-রকম ফেইল করছে কেন?

বিশাখা সিম্পলি নার্ভাস! সে পারছে না।

আপনি বিশাখাকে আগে দেখেননি। চন্দ্রার তুলনায় বিশাখা অনেক টাফ, প্র্যাকটিক্যাল। সে নিয়মিত স্টেজে অভিনয় করে। তার এ-রকম নার্ভাসনেস বিশ্বাসই করা যায় না।

বিশাখা মিসকাস্টিং হয়েছে। এই প্যানপেনে ভূমিকা, বাজে সংলাপ তার মুখ দিয়ে ঠিক মতো বেরুচ্ছে না।

ইউনিটের অন্য লোকজনদেরও এ-রকম দুর্ঘটনা ঘটছে কেন বলুন? সবই কাকতালীয়।

দেখুন, কারুর সর্দিতে গলা বসে যাওয়া কিংবা ক্যামেরার লেন্সে ফাঙ্গাস পড়ার জন্যও যদি কোনও মৃত আত্মাকে দায়ী করা হয়, তাহলে আমার বলবার কিছু নেই।

আপনি যাই বলুন, কাল সন্ধের পর এখানকার বাতাসে আমি যেন মাঝে মাঝেই চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। আমি নিজে এসব ঠিক বিশ্বাস করি না, তবু এ-রকম একটা ফিলিং হচ্ছে ঠিকই। মেয়েটা এমন ভাবে জীবনটা নষ্ট করল। কতটা দুঃখ তার বুকে জমে ছিল...।

আমি চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলাম। জ্বরের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া বিস্বাদ লাগছে। তবু অভ্যেসবশে টেনে যাচ্ছি।

একটু থেকে থেকে রবীনবাবু আবার বললেন, চন্দ্রার প্রবলেমটা কী ছিল জানেন? বলা যায়, আইডেনটিটি ক্রাইসিস। চন্দ্রার ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু ও ঠিক নিজের ক্ষেত্রটা বেছে নিতে পারেনি। পড়াশুনোয় ভাল ছিল, অধ্যাপনার লাইনে গেলে নাম করতে পারত। গানের গলাও ছিল বেশ সুরেলা, ঠিকমতো চর্চা করলে গায়িকাও হতে পারত নিশ্চয়ই। একটু চেষ্টা করলেই বিদেশে চলে যেতে পারত অনায়াসে। কিন্তু ওর রূপের জন্যই, ওকে যেন জোর করে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল সিনেমা লাইনে। এইসব মেয়ে, যে-কোনও লাইনেই টপে যেতে না পারলে খুব কষ্ট পায়। যোগ্যতা আছে, অথচ যেতে পারছে না।

আমি বললাম, পড়াশুনোয় ভাল, গানের গলা আছে, চেহারাও সুন্দর, এইসব গুণগুলো থাকলে তো অভিনয়েও সাকসেসফুল হতে পারে। সেটা পারল না কেন চন্দ্রা? ঠিকমতো সুযোগ পায়নি বলে?

রবীনবাবু বললেন, ঠিক তা নয়। ফিল্ম লাইনে ও নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। ফিল্মের জগতটা এখন মেল ডমিনেটেড, এটা তো মানবেন? চন্দ্রা কোনও পুরুষকেই সহ্য করতে পারত না।

আমি বেশ বিস্ময়ের দৃষ্টি দিতেই রবীনবাবু বললেন, তার মানে কিন্তু এই নয় যে, চন্দ্রার খুব বেশি মরাল স্ক্রুপুলস ছিল। আধুনিক মেয়ে একা একা অনেক জায়গায় ঘুরছে, শুটিং-এর সময়েও তো অভিভাবকদের কক্ষনও সঙ্গে আনত না। এমনিতে পুরুষদের সঙ্গে মিশত, হাসি-ঠাট্টা করত, সে-সব ঠিক ছিল, কিন্তু কেউ একটু ঘনিষ্ঠতা করলেই গুটিয়ে নিত নিজেকে। ফিল্মেও ওর প্রেমের অভিনয় এই জন্যই কাঠ কাঠ মনে হত। আবেগ নেই, নিষ্প্রাণ। চন্দ্রা এক-এক সময় বলেও ফেলত, কোনও পুরুষই তার যোগ্য নয়। সে যাদের দেখেছে, তারা কেউই যথার্থ পুরুষ নয়।

আমি হেসে বললাম, অর্থাৎ তার জীবনের প্রিন্স চার্মিংকে সে খুঁজে পায়নি।

রবীনবাবু বললেন, অনেকটা তাই! তার এই সূক্ষ্ম অবজ্ঞা সিনেমা লাইনের পুরুষেরা ঠিক বুঝে যেত, তারা অপমানিত বোধ করত, সেই জন্য তারা চন্দ্রাকেও বেশি ওপরে উঠতে দিতে চায়নি।

আপনি চন্দ্রাকে খুব ভালভাবে স্টাডি করেছেন, তাইনা?

হ্যাঁ।

আমরা দু'জনের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলাম এক ধরনের সম্মতিতে। একে বলা যায় জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট। চন্দ্রার সঙ্গে রবীনবাবুর কত দিনের পরিচয় এবং কতখানি ঘনিষ্ঠতা, সে-বিষয়ে আর প্রশ্ন তোলা চলবে না।

রবীনবাবু চলে যাবার একটু পরেই প্রতিমা এলেন ওর খোঁজ নিতে। স্বামীটি এখানে নেই শুনে উনি চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়েও ফিরে তাকালেন। মেয়েরা এ-সব ঠিক বুঝতে পারে।

রবীনবাবুকে আমার জ্বরের কথা বলিনি, উনিও কিছু জিজ্ঞেস করেননি। কিন্তু প্রতিমা ভুরু তুলে বললেন, আপনার শরীর খারাপ নাকি? চোখ দুটো ছল ছল করছে।

কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বললেন, বেশ জ্বর দেখছি। ডাক্তার দেখিয়েছেন?

আমি বললাম, এক দিনের জ্বরে কেউ ডাক্তার দেখায় নাকি? ও কিছুনা।

কিছু ওষুধ খেয়েছেন? খাননি নিশ্চয়ই। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার কাছে সব সময় থাকে।

আমার নিজস্ব ওষুধের কথা উল্লেখ না করে বললাম, আমি যখন তখন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাই না। আমার ঠিক বিশ্বাস নেই। কিছু লাগবে না।

রবীনবাবুর কিন্তু খুব অসুখের বাতিক। আপনি এই কথা বলছেন, আর রবীনের একটু জ্বর হলেই পাঁচ-সাতটা ওষুধ খেয়ে নেয়।

আমার বিনা ওষুধেই সেরে যায়।

শুয়ে থাকুন তাহলে, বিশ্রাম নিন। আপনার রাত্তিরের খাবারটা এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব?

আমি উত্তর না দিয়ে প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অসুখের কথা যখন উঠছেই, তখন এই সুযোগে আমার একটা কৌতূহল মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আপনার কিছু একটা অসুখ আছে শুনেছি? কী অসুখ?

প্রতিমা সহজে হাসেন না। এখন তার সারা মুখখানাই হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, যদি বলি আমার অসুখটা হচ্ছে পাগলামি, তাহলে বিশ্বাস করবেন?

সব মানুষই তো একটু একটু পাগল।

কিন্তু আমি এক-এক সময় সীমানা ছাড়িয়ে যাই। কিছুতেই যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে পারি না। খিটখিটে হয়ে যাই, সন্দেহ বাতিক দেখা দেয়। রবীনকে তখন জ্বালাতন করি। এখানে আসবার আগে দু'মাস আমাকে নার্সিংহোমে থাকতে হয়েছিল।

আপনাকে তো আমার পারফেক্টলি নর্মাল বলে মনে হয়। একটু বেশি নর্মাল। কথাবার্তার মধ্যে সব সময় ব্যালান্স থাকে।

সেটাই বোধহয় খারাপ। এক-এক সময় ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়। মনে হয় জীবনটাই অর্থহীন। ঠিক দু'রকম ফিলিং হয়, জানেন। মনে হয়, আমার যা যা প্রাপ্য তা পাইনি। রবীন আমাকে ঠকাচ্ছে। আমার ছেলে মেয়েরাও আমাকে ভালবাসার অভিনয় করে। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অনেকের চেয়েই আমি বেশি পেয়েছি। সেই জন্য অনেকে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমার সুখ কেউ কেড়ে নিতে চাইছে। তখন ইচ্ছে হয়, খুব ইচ্ছে হয়–

হঠাৎ থেকে গিয়ে তিনি জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আমি বললাম, মাঝে মাঝে প্রত্যেক মানুষের মনেই এ-রকম নানা রকম প্রশ্ন আসে। অদ্ভুত ফিলিং হয়। অকারণে দারুণ নৈরাশ্য বুকে চেপে ধরে, আবার এ-সব কেটেও যায়। তাই না?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রতিমা আপন মনে বললেন, ওই যে চন্দ্রা বলে মেয়েটি, ইচ্ছে করে সমুদ্রে ভেসে গেল, কতখানি অভিমান নিয়ে আত্মহত্যা করল, এক-এক সময় মনে হয়, ওর দীর্ঘশ্বাস, ওর অভিশাপ আমারও গায়ে লাগছে। আমার চামড়া ঝলসে দিচ্ছে। দেখুন, দেখুন, আমার চামড়ায় কী-রকম ফোস্কা পড়েছে, আজই!

আমি আর কোনও কথা খুঁজে পেলাম না।

প্রথম পরিচয়ের সময় এই দম্পতিটিকে আমার বেশ আদর্শ মনে হয়েছিল। এখন দেখছি, এরা দু'জনেই আমার অভিজ্ঞতার বাইরের মানুষ। প্রতিমা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। অনেক লেখাপড়া শিখেছেন অথচ উনি বিশ্বাস করেন, ওঁর চামড়ায় ফোস্কা পড়েছে কোনও অশরীরীর দীর্ঘশ্বাসে। এটা কি ওঁর পাগলামি, না উনি আগে থেকেই জানতেন যে, চন্দ্রার সঙ্গে ওঁর স্বামী বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল?

রবীনবাবুও যেন কিছু একটা অপরাধবোধে ভুগছেন। উনিও বাতাসে চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনছেন। এটা পাগলামি নয়, স্রেফ সংস্কার। বাতাসে কারুর দীর্ঘশ্বাস একমাত্র কবিতার মধ্যেই ভেসে বেড়াতে পারে।

চন্দ্রার মৃত্যুর পরদিন সন্ধ্যায় নৌকোয় পা ঝুলিয়ে বসা একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলাম। মেয়েটি এক সময় কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। প্রথমে আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম, তা ঠিক। আমার বদলে যদি রবীনবাবু দেখতেন ওই দৃশ্য?

চন্দ্রার জায়গায় বিশাখা এসেছে, দু' জনের চেহারায় মিল আছে। কিন্তু সেদিন কি ওই নৌকোয় বিশাখা বসেছিল? দুপুরবেলা বৃষ্টির মধ্যে লাল ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল বিশাখা? এসব কথা বিশাখাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

না, বিশাখা নয়, আমি জানি, সে কে!

.

১৩.

রাত এখন ক'টা? আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? কে যেন আমাকে ডাকছে।

আমার যে জ্বর হয়েছিল, তা মনেই পড়ল না। শরীরে কোনও অস্বস্তি বেদনার অনুভূতি নেই। তবু আমি জেগে উঠলাম হঠাৎ। ঠিক আগের মুহূর্তেই কেউ যেন আমার নাম ধরে ডেকেছে, এখন কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সেই ডাক শোনার চেষ্টা করলাম। সব দিক চুপচাপ। তবু স্পষ্ট অনুভূতি হচ্ছে, কেউ ডেকেছে, কেউ আমাকে জাগাতে চেয়েছে। কিংবা আমি নিজেই নিজেকে ডেকেছি?

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবে অল্প জ্যোৎস্না আছে। বাতাসের গন্ধে মনে হয়, এখন মধ্যরাতের কম নয়। বেলাভূমি সম্পূর্ণ বিজন, আজও ঢেউয়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে ফসফরাসের মালা।

জামাটা গলিয়ে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বালির বাঁধটা দিয়ে স্লিপ খাবার মতো গড়িয়ে নামলাম নিচে। এবার ডান দিকে, না বাঁ-দিকে যাব?

ডান দিকে। কোনাকুনি জলের দিকে। আজ বাতাস খুব কম, তাই ঢেউয়ের শব্দ তেমন শোনা যাচ্ছে না। আলো জ্বলছে না রাস্তার ধারের একটা বাড়িতেও। অনেকেই দরজা-জানলা সব খোলা রেখে ঘুমোয়। চুরি-ডাকাতির ভয় গোপালপুরে প্রায় নেই বললেই চলে।

আকাশে মেঘ নেই, অনেক তারা। গত দুদিন এই সমুদ্রে একটা জাহাজও দেখা যায়নি। আজকের রাতটা ভারি সুন্দর। সুন্দরের একটা প্রগাঢ় আলিঙ্গন আমি অনুভব করছি সর্বাঙ্গে।

জলের ধার ঘেঁষে বসে আছে একটি রমণীমূর্তি। তার নীল শাড়ির রঙ মিশে গেছে রাত্রিতে। আঁচল উড়ছে। পিঠের ওপর খোলা চুল। আমার পায়ের কিংবা নিশ্বাসের শব্দ শুনেও সে মুখ ফেরাল না।

তাকে দেখে আমি একটুও চমকালাম না, কিংবা অবাক হলাম না। আমি জানতাম, সে এখানে থাকবে। সে-ই তো আমাকে ডেকেছে।

একটু দূরত্ব রেখে আমিও বসলাম ভিজে বালির ওপর। আর একটা সিগারেট ধরালাম। দেশলাইয়ের আগুন একটু যেন ছ্যাঁকা দিল রাত্রির গায়ে।

নারীটি একবার তাকাল আমার দিকে। জ্যোৎস্নায় ঝক ঝক করছে তার চোখ। আমি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ, কেয়া?

আমি বললাম, তোমার হাসিটি ঠিক আগের মতোই আছে। আমি জানতাম, তুমি ঠিক ফিরে আসবে।

আপনি জানতেন? কী করে জানলেন?

আমি জানতাম। কারণ আমি যে খুব তীব্রভাবে চেয়েছি। আমি চেয়েছি, তুমি ফিরে এসো। তুমি ফিরে এসো। আমার সেই চাওয়াটাই তোমাকে তৈরি করেছে। তুমি অলীক, তুমি মায়া, তবু তুমি এখন বাস্তব।

নারীমূর্তিটি আবার খুব ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগল।

আমিও হেসে বললাম, সেদিন তুমি নৌকোয় একা একা পা ঝুলিয়ে বসেছিলে, আমি তখন–

অবজ্ঞা করে চলে গেলে, তাই না? মানুষ কীরকম বোকা হয় দেখে নিজেই কল্পনা দিয়ে একটা মূর্তি গড়ে, আবার নিজেই সে তাকে চিনতে পারে না।

আপনি আমাকে তৈরি করেছেন? ভারি মজা তো।

মানুষের যখন কোনও প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, মানুষ মনে মনে তার কথাই ভাবে, খুব গভীর ভাবে ভাবতে ভাবতে তাকে সশরীরে দেখতে পায় এক-এক সময়। কিন্তু তখন সেই প্রিয়জনকে দেখেই আবার মানুষ ভয় পায়। আমারও যে এই দুর্বলতা হয়েছে, তা আমি নিজেই এত দিন টের পাইনি।

আপনি বুঝি কেয়ার কথা খুব ভাবেন? খুব দুঃখ পেয়েছিলেন?

মাঝখানে অনেক দিন ভুলে ছিলাম, তা ঠিক। চন্দ্রাকে প্রথম দেখেও বুঝতে পারিনি, তার সঙ্গে কেয়ার এতখানি মিল। চেহারার মিল, হাঁটার ভঙ্গি, হাসি, অনেকটাই কেয়ার মতো। চন্দ্রা যখন জলের তলায় চলে গেল, তার পরেই এই মিলগুলো চোখে পড়ল। তারপর থেকে, আমি মনে মনে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি, কেয়া। বৃষ্টির মধ্যে দুপুরবেলা লাল ছাতা মাথায় দিয়ে তুমিই তো যাচ্ছিলে, তাইনা? তখনও চন্দ্রার হঠাৎ ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুমিও যে ফিরে আসতে পারো সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি।

ওগো লেখকমশাই, আপনি যে বললেন, আমি অলীক, মায়া। আমার হাতটা ছুঁয়ে দেখেন তো। আমি রক্তমাংসের মানুষ।

নারীটি তার একটি হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, আমি একটু ঝুঁকে ছুঁলাম। সেই হাত জীবন্ত রক্তস্রোতে উষ্ণ।

তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে আমি বললাম, শুধু অলীকে কি সাধ মেটে? আমি তো চেয়েছি, তুমি রক্তমাংসেও ফিরে আসবে।

মেয়েটি সুর করে বলে উঠল, এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে, অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে, জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময় শূন্য পরিণাম...। আঃ, কী ভাল লাগে জলের ধারে একা বসে থাকতে।

তুমি কি কেয়া নও? তুমি চন্দ্রা?

এই যে বললেন, আপনি আমাকে তৈরি করেছেন? আপনি কাকে তৈরি করেছেন, তা নিজেই জানেন না?

চন্দ্রার কথা ভাবতে গিয়ে কেয়ার কথা মনে পড়ে গেল। চন্দ্রা ফিরে আসুক, তা-ও আমি চেয়েছি। নিশ্চয়ই চেয়েছি। চন্দ্রার মতো মেয়েই-বা কেন হারিয়ে যাবে? কেয়া, তোমার কী হয়েছিল? তুমি কি ইচ্ছে করে সুন্দরবনের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলে?

ও-সব কথা এখন ছাড়ুন তো! সমুদ্রকে দেখুন। সমুদ্রকে আপনার জীবন্ত মনে হয় না?

জীবন্ত তো বটেই। কে বলেছে, সমুদ্র জীবন্ত নয়! আকাশও জীবন্ত।

আমি আকাশ নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। সমুদ্রকে আমার কি মনে হয় জানেন? ঠিক যেন এক বিশাল পুরুষ। জলে যখন নামি, বড় বড় ঢেউয়ের ঝাপটা যখন গায়ে লাগে, ঠিক যেন মনে হয় এক দুর্দান্ত প্রেমিক, অমন স্পর্শ আর কোনও প্রেমিক দিতে পারে না। সেই জন্যই একবার স্নানে নামলে আমার আর ইচ্ছেই করে না জল ছেড়ে উঠতে।

তুমি মানুষের চেয়েও জলকে এত ভালবাসো?

এ-কথাতেও বিষাদের সুর নেই, নারীটি সব কথাই বলছে হাসতে হাসতে। আমি যে-হাতখানা ধরে আছি, সেইহাতে এখনও খেলা করছে প্রাণচাঞ্চল্য। কিছুক্ষণের জন্য আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

সেই রমণীর পায়ে এসে লাগছে ঢেউ। শাড়ি ও শায়া একটুখানি তুলে সে দু'পায়ের পাতা দিয়ে চাপড় মারছে জলে। সাদা ফেনা যেন রুপোর মলের মতো অলঙ্কার হয়ে যাচ্ছে।

সে আপন মনে বললো, রাত্তিরবেলা, আর কোনও শব্দ নেই, দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সমুদ্র, এই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, কে কীসে সার্থক হল কিংবা না হল, তাতে কিছুই আসে যায় না।

আমি বললাম, তাহলে জলের গভীরে ডুবে যাবারও কোনও মানে হয় না। এটা জীবন নিয়ে বড্ড বেশি বিলাসিতা। একটি মেয়ে সমুদ্রে একা একা নৌকোয় দাঁড় বাইতে বাইতে গান করছে আপন মনে, এটা দৃশ্য হিসেবে সুন্দর। কিন্তু তারপর একেবারে হারিয়ে যাওয়াটা অসুন্দর। ক্ষমার অযোগ্য। চলন্ত স্টিমার থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়াটাও।

আমার কথা অগ্রাহ্য করে সে বলল, মানুষের আলিঙ্গনের মধ্যেও ভেজাল থাকে, কিন্তু একা একা জলের সঙ্গে খেলা করা, আঃ, কী আরাম!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আমি এখন জলে নেমে স্নান করব।

চমকে উঠে বললাম, এত রাতে?

রাত্তিরেই তো ভাল। দিন আর রাত্তিরের মধ্যে মেয়েরা রাত্তিরটাই বেশি পছন্দ করে, জানেন না? আপনিও স্নান করবেন? আসুন না।

আমি? না।

কেন? ভয় পাচ্ছেন।

ভয়ের কী আছে? আমি সাঁতার মোটামুটি ভালই জানি। কিন্তু সমুদ্র তো তোমার প্রেমিক, আমার কেউ না!

মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে সে বলল, আপনি রেগে যাচ্ছেন সমুদ্রের ওপর? নাকি হিংসে হচ্ছে। তাহলে আপনি ফিরে যান।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলাম বাড়ির দিকে। আমি নিজে যাকে তৈরি করেছি, তারও মুখের কথাগুলো আমার বসানো নয়। কাল্পনিক মূর্তিরও একটা আলাদা সত্তা থাকে। সে ইচ্ছেমতো চলে। সে আমাকে আঘাত দিতেও পারে। সে বলল, আমি সমুদ্রকে ঈর্ষা করি।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এসে আমার যেন ঘোর ভাঙল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটা খটকা লেগেছে। এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বললাম আমি? কেয়া, না চন্দ্রা? কিংবা, যে-উষ্ণ হাতখানি আমি ধরেছিলাম, সেই হাতখানি বিশাখার?

নাঃ, এখন আবার ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।